নিজের চোখে দেখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ কসমো ডিপো ॥ কলকাতা-৭০০০১২

কমল দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাত্রি দেড়টার সময় আমি দাঁড়িয়েছিলুম সাগরমেলার কাছে সেই একটিমাত্র সেতুর ওপর, যে সেতু ছাড়া সাগর দ্বীপে প্রবেশের অন্য কোনো রাস্তা নেই। অন্তত সেদিন ছিল না। শনিবার, সেদিন সূর্যোদয়ের আগেই সমস্ত যাত্রী সাগরদ্বীপে এসে পৌঁছোতে চায়।

রাত্রি দেড়টায় সাগরদ্বীপ একটি হোগলা নগরী। হোগলা ও বাঁশ দিয়ে তৈরি অসংখ্য ছোট ছোট ঘর ও চালা, তার ভেতর থেকেও মানুষ উপছে পড়েছে, বাইরে খোলা মাঠে অগুনতি মানুষ, রাস্তার দু'পাশে মানুষের ক্ষণস্থায়ী ডেরা। যারা আগেই পৌঁছেছে তারা এখন ঘুমের আবল্লিতে ঢুলছে, যারা এইমাত্র পৌঁছোলো, কোনোক্রমে পেয়েছে একটু বসবার জায়গা—তারা চুল্লি জ্বালিয়ে চাল ফোটাতে বসেছে। সেই সব অনেক চুল্লির আগুনের আভাও মৃত শালিকের ডানার মতন বিবর্ণ—কারণ সাগরমেলা এবার বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে।

ব্রীজের মাঝখানে বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়েছে আসা-যাওয়ার জন্য। এখন কেউ যাবে না, সবাই আসছে, রাত দুপুরেও স্রোতের মতন আসছে—অতি বৃদ্ধ, অশক্ত বৃদ্ধা, জোয়ান সন্ন্যাসী ও শিশু। সারা দিনে এই সেতুটা ভেঙে পড়ার গুজব উঠেছিল চার-পাঁচ বার। ভেঙে যে পড়েনি সেটাই মিরাকল্। একটা সরু কাঠের সেতুর ওপর এক সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষের ট্রাফিক জ্যাম অসংখ্যবার ঘটেছে। হুড়োহুড়িতে মানুষের পায়ের তলায় মানুষ পিষ্ট হবার ঘটনাও ঘটেছে—এবং সেতু পার হতে না পেরে বেশ কিছু নারী-পুরুষ পাশের খালে নেমে বুক জল ঠেলে এপারে এসেছে—তা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এরা কেন আসে? কেন পাগলের মতন এত কষ্ট সহ্য করে, এত দুর্গম পথ পার হয়ে এরা ছুটে আসে? সেটাই আমি

জানতে চাইছিলুম ভূতে পাওয়া মানুষের মতন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বুড়ো-বুড়ি হুড়োহুড়ি করে এসে এই সাগর সঙ্গমে কি পেতে চায়?

এবার পৌঁছোনোর কষ্ট হয়েছে সবচেয়ে বেশী। পুণ্যস্নানের আগের দিন সকাল থেকেই হঠাৎ দখিনা পবন বইতে শুরু করে। দখিনা পবন শুনতে বেশ ভালো হলেও সমুদ্রযাত্রার পক্ষে অতি বিপজ্জনক। কোনো নৌকো বা মোটরলনচ সাগর দ্বীপে যেতে সাহস পায় না। তা ছাড়া খবর এলো, সাগর দ্বীপে পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। সরকারী প্রচার যন্ত্রে এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ ঘোষণা করা হচ্ছে বারবার। নামখানায় মানুষে মানুষে ধূল পরিমাণ। যারা উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল বা কাশ্মীর থেকে এসেছে—তারা কি এতদূর এসেও সঙ্গমে ডুব না দিয়ে ফিরে যাবে? এরা মরবে, তবু ফিরে যাবে না। সুতরাং চিমাগুড়ি নামে একটা অখ্যাত জায়গায় কোনোপ্রকারে যানবাহনে পৌঁছেই তারপর সাত-আট মাইল পায়ে হাঁটা পথ। শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, গড্ডলিক প্রবাহের মতন মানুষের দীর্ঘ যাত্রা। রাত দুপুরেও সেই প্রবাহের বিরাম নেই।

কেন এরা আসে?

ব্রীজের ফাঁকা দিকটায় দাঁড়িয়ে আমি ওদের দেখছিলাম। একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, শুনিয়ে জী, আপনি কতদূর থেকে আসছেন?

বৃদ্ধ আসছেন অযোধ্যা থেকে। সঙ্গে আসছেন বৃদ্ধা ও পুত্রবধূ, এবং নাতি। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে পুটুলী। পথ কষ্ট সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। তীর্থযাত্রায় কষ্ট হলে বাড়ে পুণ্য —এরকম ওদের বিশ্বাস। কিন্তু আমি তো তীর্থ বিশ্বাস করি না, তাই প্রশ্ন করি, পণ্ডিতজী, এটা কি তীর্থ? এখানে এলে কি হয়? কী এর মাহাত্ম্য?

বৃদ্ধ তা জানেন না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। আমি তাকে নমস্কার করে বিদায় দিই।

আবার আর একজনকে জিজ্ঞেস করি। সেও কিছু জানে না। সে বললে, সবাই আসে, তাই আসি।

আমার জেদ চেপে যায়। আমি একটা উত্তর চাই। প্রায় পঞ্চাশ জনকে থামিয়ে আমি একই রকম প্রশ্ন করি। তাদের মধ্যে বিহারী, উত্তরপ্রদেশী, পাঞ্জাবী, হরিয়ানানিবাসী ওড়িয়া কত রকমের লোক, বাঙালীর সংখ্যা কম হলেও চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের মাত্র একজনকে দেখেছিলাম। কেউ কোনো উত্তর দিতে পারে না। কেউ কেউ বলে বংশ পরম্পরায় এরকমই চলে আসছে। অনেকেই কপিল মুনির নাম পর্যন্ত শোনেনি। যারা বা শুনেছে, তাদের আমি জেরার ছলে বলি, কপিল মুনি তো শুনেছি নাস্তিক ছিলেন, তাকে তোমরা কপিল ভগবান বলো কেন? তখন তারা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়।

হিন্দুদের মতন এমন ধর্মপাগল অথচ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ জাত বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। ধর্মের কোনো তত্ত্ব কিংবা শাস্ত্র সম্পর্কে এ জাতির অধিকাংশ মানুষেরই কোনো জিজ্ঞাসা নেই, শুধু কিছু লোকাচার ও সংস্কার দিয়ে আবদ্ধ। পরমার্থ সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান নেই বলেই তীর্থক্ষেত্রে টাকা খরচ করে পুণ্য অর্জন করতে হয়। প্রত্যেক দেবালয়ে কিংবা তীর্থস্থানে এসে যার যা সাধ্য টাকা পয়সা কিংবা স্বর্ণালঙ্কার ছুঁড়ে দেয়, তাতেই সব পাপ-খণ্ডন হবে। নিজেরা না খেয়ে, পায়ে হেঁটে আসে, ঠাকুরের পায়ে পয়সা দেবার জন্য। বেচারা কপিল মুনি—মানুষের সংশ্রব ছেড়ে এই পাতাল-পুরীর দ্বারের কাছাকাছি এসে আশ্রম বানিয়েছিলেন—কোন এক অদ্ভুত কিমাকার গল্পের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে তাঁর নামে বানানো মন্দিরে পয়সা ছোঁড়ে। সেই সব পয়সা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় দূর দেশী পাণ্ডা-মোহান্তরা। তা প্রায় তিরিশ-চল্লিশ লাখ টাকা হবে।

পয়সার লোভে আসে আরও অনেকে। একজন মানুষকে পেলাম, সে এসেছে গয়া জেলা থেকে। প্রতি বছরই আসে। তার

সঙ্গে একটি বাছুর। না, বাছুরটাকে সে গয়া থেকে সঙ্গে আনেনি। বাছুরটিকে স্থানীয় পল্লী থেকে ভাড়া করেছে আঠাশ টাকায়। বাছুরের ল্যাজ ধরে মন্ত্র পড়ার একটি রেওয়াজ আছে এই মেলায়। স্বামী-স্ত্রী মিলে একবিন্দুও অর্থ না বুঝে কিছু সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে যায়, কিছু পয়সা দক্ষিণা দেয়, দরদাম করে যতটা কম দেওয়া যায়। ভগীরথ পিতৃবংশ উদ্ধার করেছিলেন বলে পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে এখানে শ্রাদ্ধ করার নিয়ম হয়েছে। বাছুরের ল্যাজ ধরে কেন? পাঁচ-সাত রকমের বাজে গল্প শোনা যাবে। যাই হোক, বাছুর-ব্যবসায়ীর এতে দু'-তিন শো টাকা লাভ হয়। পকেটমার, ঠগ, জোচ্চোর এবং মেয়ে-লোভী ঘুর ঘুর করে আশে-পাশে।

ওঃ জীবনে আমি এক সঙ্গে এত বুড়ো-বুড়ি দেখিনি। যতটা সহ্য করা যায় তার চেয়ে একটু বেশীমাত্রার বুড়ো-বুড়ি। তারা খোলা আকাশের নীচে, এ ওর গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। তাল তাল মাংসপিণ্ডের মতন মানুষ। কিংবা আলুর বস্তা খালি করার মতন কেউ যেন এখানে হুড়হুড় করে মানুষ ঢেলে দিয়েছে। দয়া, মায়া, করুণা প্রভৃতি অনুভূতিগুলো এখানে এলে ভোঁতা হয়ে যায়। এক-আধজন মানুষের দুঃখ দেখলে দয়া হয়—যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অমানুষিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে—সেখানে দয়া খরচ করার প্রশ্ন ওঠে না।

সাংবাদিকরা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বারবার খোঁজ নিচ্ছেন, কোথাও কেউ মারা গেছে কিনা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা। সেরকম ঘটনা ঘটলেই খবর হয়। বস্তুত, প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এক্ষুণি কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু সংবাদ শুনলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যে কোনো জায়গায় আগুন লাগতে পারে, পুকুরের পচা জল খেয়ে যে-কোনো সময় মড়ক লাগতে পারে, এলাহাবাদের কুম্ভমেলার মতন ভয়াবহ ঘটনা যে-কোনো বছরেই সংঘটিত হতে পারে গঙ্গাসাগরে। প্রত্যেক বছরেই যে সে ঘটনা ঘটেনা তার একমাত্র কারণ, মানুষের প্রাণ বড় জেদী—সহজে খাঁচা ছাড়া হতে চায় না।

তা, এত লক্ষ মানুষের মধ্যে কয়েক হাজার বুড়ো-বুড়ি যদি মারা যায়, তাতে ক্ষতি কি? এরা গরীব, এরা মূর্খ, এরা তো মৃত্যু শিয়রে নিয়ে সব সময় বসে আছে। শুধু মেলা প্রাঙ্গণে এসে মরলে সরকারী ব্যবস্থাকে একটু বিব্রত করা হবে! বিদেশী সংবাদ-পত্রগুলি হৈ হৈ করে উঠবে। মেলায় সরকারী অব্যবস্থা নিয়ে অনেকে বলাবলি করছিলেন। আসলে ব্যবস্থাটুকুই এত সামান্য যে অব্যবস্থা আর বেশী কি হবে! কত লোক আসবে, তারা কীভাবে আসবে, কোথায় থাকবে, কী খাবে—এ নিয়ে কোনো বিশদ পরিকল্পনাই নেই। সব কিছুই জোড়াতালি। স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীরা প্রাণান্তভাবে খাটছেন দেখলাম—কিন্তু তাঁদের রসদ যে নগণ্য। এইসব দরিদ্র মানুষ ও সাধু সন্ন্যাসীর বদলে যদি ধোপ-দুরস্ত পোষাক পরা উচ্চশ্রেণীর সামাজিক মানুষের সংখ্যাধিক্য হতো —তাহলে সব ব্যবস্থাই আরও ভালো হতো, অনেক সুসজ্জিত দোকানপাট খুলতো—এতো বলাই বাহুল্য।

ধোপদুরস্ত পোষাক পরা যারা গেছে—তাদের জন্য ভালো ব্যবস্থাও আছে। তারা একালের কুলীন সরকারী অফিসারবৃন্দ—এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন। যে পথে লক্ষ লক্ষ লামুষ হেঁটে আসছে —সে পথে কদাচিৎ একটি দুটি জিপ বা রেড ক্রসের গাড়ি দেখা যায় —তাতে ভর্তি সরকারী অফিসারদের গৃহিণী ও মাসী পিসী। অফিসাররা গেছেন ডিউটিতে—গৃহিণী পুত্র-কলত্র ঠিক বেড়াতে যায় নি—এখানে আছে পুণ্যের লোভ। এদের জন্য আছে বাসস্থান এবং পুলিস বা স্বেচ্ছাসেবক পাহারায় ভিড় সামলে স্নানের ব্যবস্থা ও মন্দির দর্শন। মেলার মধ্যে সুদৃশ্য সাদা রঙের তাঁবুতে থেকেছেন মন্ত্রীরা। যেমন আগেকার দিনে নেটিভদের এড়িয়ে সাহেবরা থাকতেন। আমার কাছে এসব কিছুই বিসদৃশ মনে হলো না—এ সবই তো স্বাভাবিক। সবাই আরাম চায়। মুখে কিংবা বক্তৃতায় নানারকম কথা বলতেই হয়, কিন্তু নিজস্ব আরামের ব্যবস্থা তেমন কেউই ছাড়তে চায় না—যার ক্ষমতা

আছে, হুকুমতামিল করার লোক আছে। মন্ত্রীরা এলেন দেখলেন, বাণী দিলেন, চলে গেলেন।

এখানে নদীর পরপার দেখা যায় না, বাঁ দিকে তাকালে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। শান্ত নিরুত্তাপ সকালে এই নদীর দৃশ্য বড় মনোরম। দিগন্তের দিকে তাকাবার সময় নেই কারুর, কাদামাখা পায়ে সবাই ছুটে যাচ্ছে স্নান করতে। এই নদী বড় পবিত্র, পতিতকে উদ্ধার করে গঙ্গা। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা সাগর একবার। কিন্তু এত পবিত্র নদীকূলও পুরীষে ভর্তি করে দিতে কারুর বিবেকে আটকায় না। ঘুরেঘুরে দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, এত মানুষের পাপ ধুয়ে দিচ্ছে—নদীর জল নিশ্চয়ই এখন পাপে থিক থিক করছে। বহতা নদী আর রমতা সাধুকে নাকি কোনো মালিন্য স্পর্শ করে না। কিন্তু কত রমতা সাধু, নগ্ন ইন্দ্রিয় জয়ী—তবু তো দেখলুম পয়সা লোভী, আর বহতা নদীর জলেও এখন অনেক আবর্জনা।

আমি স্নান করিনি, কারণ আমি নিজেকে পাপী মনে করি না। তা হলে গিয়েছিলুম কেন? আমরা উত্তর বঙ্কিমবাবু অনেকদিন আগে কপালকুণ্ডলার নবকুমারের মুখে বসিয়েছেন। পুনরুক্তি ভয়ে আর উল্লেখ করলাম না।

২

সব কলেজেই ছাত্রদের দেওয়াল পত্রিকা থাকে। আমাদের কলেজে যে তিনটি দেওয়াল পত্রিকা ছিল তার মধ্যে দুটি দুই রাজনৈতিক দলের মুখপত্র। খুব গরম গরম কথা থাকতো তাতে। এবং সেই দুটোকে ঘিরেই ভিড় থাকতো বেশী। আর একটি দেওয়াল পত্রিকা একটু কোণের দিকে অন্ধকারে ঝুলে থাকতো—সেটিতে শুধু গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ। গল্প ও কবিতাগুলি খুবই ব্যাক্তিগত আর প্রবন্ধগুলো 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' কিংবা চরিত্রহীন উপন্যাসে কে চরিত্রহীন এই জাতিয়। ঐ পত্রিকাটা প্রকাশ করতো অংশুমান, সে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী ও পাজামা পরতো—এবং খুবই গর্বিত ভাব দেখাতো সব সময়।

এক দিন গনেশ কেবিনে অংশুমানকে একা একা চা খেতে দেখে আমি ওর পাশে বসলাম এবং দরাজ গলায় অর্ডার দিলাম ' দেখি, দুটো মটন কাটলেট, দু' প্লেটে।

অংশুমান মুখে কিছু না খেয়ে বলে ভুরু দুটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন করে রাখলো।

আমি চুপি চুপি বললাম, তোর পত্রিকায় আমার একটা গল্প নিবি ?

অংশুমান অত্যান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, গল্প লিখবি। তুই ?

আমি একেবারে মরমে মরে গেলাম। অন্যরা শুনে ফেলছে। একটু আস্তে বললেও তো পারতো।

অংশুমান এরপর হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বললো, গল্প লেখা কি এত সোজা ? ইচ্ছে করলেই লিখে ফেলা যায় ? আগে লিখেছিস কখনো ?

আমি বাংলাতে বরাবরই কাঁচা। সব পরীক্ষাতেই বাংলায়

কম নম্বর পেয়েছি, তবু লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কবিতা লেখার বদরোগ ছিল। কারুকে কখনো দেখাইনি। হঠাৎ গল্প লেখার ইচ্ছে জাগার একটা কারণ ছিল। কলেজে সন্ধ্যাশ্রী নামের একটি মেয়ে আমাকে অপমান করেছিল। সন্ধ্যাশ্রীর বড় রূপের গর্ব, আমাকে সে গ্রাহ্যই করে না। একদিন এক বাস স্টপে দুজনে দাঁড়িয়েছিলাম—সন্ধ্যাশ্রী বাদাম ভেঙে ভেঙে কুটকুট করে খাচ্ছিল —এমন সময় থার্ড ইয়ারের সূর্যদা এসে দাঁড়ালো। সূর্যদার খাঁটি হীরো হীরো চেহারা। ক্লার্ক গেবল-এর মতন চওড়া কাঁধ, যেমন অহংকারী, তেমন দয়ালু। সূর্যদা আসতেই সন্ধ্যাশ্রী হাতের মুঠো থেকে কয়েকটা বাদাম সূর্যদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'খাবেন!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই যাঃ সব ফুরিয়ে গেল যে। সূর্যদা তাঁর হাতের চারটি বাদামের মধ্যে থেকে দুটি দিলেন আমাকে।

যার রক্ত মাংসের শরীর, তার এই সময় রাগে জ্বলে যাবার কথা নয়? ফুরিয়ে গেল, মানে কি? এতক্ষণ যে কুটকুট করে বাদাম খাচ্ছিলে তখন আমাকে দেবার কথা মনে পড়েনি। সূর্যদাকে দেখেই অমনি—। আমার সঙ্গে একই বাসে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু সূর্যদার সঙ্গে সে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করলো। পৃথিবীর সন্ধ্যাশ্রীরা চিরকাল এইভাবে সূর্যদাদের সঙ্গেই চলে যায়।

আমি ঠিক করে রাখলুম, সন্ধ্যাশ্রীকে এর একটা জবাব দিতেই-হবে। কিন্তু কোন উপায়ে। ওর মুখের ওপর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ঠিক জন্মের সময় ধাইমা আমার কানে কানে বলে দিয়ে ছিলেন, দেখিস, মেয়েদের সঙ্গে যেন কক্ষনো খারাপ ব্যবহার করিস না। কিন্তু খারাপ ব্যবহার না করা মানেই তো আর সব অপমান সহ্য করে যাওয়া নয়।

তখনই দেওয়াল পত্রিকার ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে। দেওয়াল পত্রিকায় কিছু বেরুলেই দু-একদিনের মধ্যে কলেজের সব ছাত্রদের মুখে মুখে ব্যাপারটা ছড়িয়ে যায়। ওর নামটা বদলে

দিলেও ওর চরিত্রটা ঠিক ফুটে উঠবে। এবং এই ব্যাপারটা কবিতায় ঠিক জমাতে পারবো না বলেই গল্প লেখার ইচ্ছেটা জাগে।

কিন্তু অংশুমান আমার যোগ্যতা বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রথম প্রথম কথাটা উড়িয়ে দেয়। তারপর অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, আচ্ছা দিস, দেখবো যদি চালানো যায়।

চার পাঁচবার কপি করার পর শেষ পর্যন্ত গল্পটা দিলাম অংশুমানকে। কিন্তু ওর আর পড়ে দেখার সময়ই হয় না। যখনই জিজ্ঞেস করি, অংশুমান উত্তর দেয়, হাতে অনেক লেখা জমে আছে, আগেরগুলো তো আগে দিতে হবে। চায়ের দোকানে ওর সঙ্গে দেখা হলে ও আর পকেট থেকে পয়সা বার করে না। ধরে নিয়েছে এখন থেকে ওর খাবারের দাম আমিই দেবো।

লেখাটা টাটকা টাটকা বেরুলেই সন্ধ্যাশ্রীর অপমানের ঠিক মতন জবাব দেওয়া যেতো। তা আর হলোই না। এখন সন্ধ্যাশ্রীকে দেখলে দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তবে একটা ব্যাপারে আরাম পেয়েছি, সন্ধ্যাশ্রী সূর্যদার কাছে পাত্তা পায়নি। সূর্যদা তখন নবনীতার জন্য পাগল।

এর কয়েক মাস বাদে কলেজের ইউনিয়ন থেকে একটি গল্প প্রতিযোগিতা ডাকা হলো। বাইরের সাহিত্যিকরা বিচার করবেন। পুরস্কৃত তিনটি গল্প ছাপা হবে কলেজ ম্যাগাজিনে। কারুকে কিছু না বলে আমার গল্পটা পাঠিয়ে দিলাম সেখানে।

তারপর আবার দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা। মাসের পর মাস কেটে যায় প্রতিযোগিতার ফলাফল আর বেরোয় না। শুনলাম এক শ পঁচাত্তরটা গল্প জমা পড়েছে—বিখ্যাত সাহিত্যিক সেগুলি দেখে ওঠার সময় পাচ্ছেন না।

শেষ পর্যন্ত কলেজ ম্যাগাজিন ছাপা হয়ে বেরুলো। পরীক্ষার মাত্র কয়েক দিন আগে। তখন ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজ ম্যাগাজিনে কি ছাপা হলো না হলো, তাতে কিছু যায় আসে না।

কিন্তু আমার মন একেবারে ভেঙে গেল। আমার গল্পটা ছাপা

হয়েছে বটে, কিন্তু আমি পেয়েছি থার্ড প্রাইজ। থার্ড হওয়ার মতন অপমানজনক কি আর কিছু আছে? এর চেয়ে আমার গল্পটা ছাপা না হলেও কত ভালো ছিল, কেউ জানতে পারতো না। এখন প্রত্যেকে নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবে হাসছে। একটা সামান্য গল্প প্রতিযোগিতাতেও থার্ড। এর চেয়ে অযোগ্যতা আর কি আছে? রাস্তায় একদিন অংশুমানকে দেখে তাড়াতাড়ি আমি লজ্জায় অন্য ফুটপাথ বদল করলাম।

পরীক্ষার পড়াটড়া আমার মাথায় উঠে গেল। সব সময় ঐ অপমান কাঁটার মতন বেঁধে। সন্ধ্যাশ্রীর কাছে আমি মনে মনে খুব অপরাধী হয়ে রইলাম। গল্প লেখার ক্ষমতাই যখন আমার নেই, তখন কেন লিখতে গেলাম ওকে নিয়ে? সমুদ্র, নদী, পাহাড়, আকাশ তাজমহল—এই সব নিয়ে কি কেউ ঠাট্টা করে?

পরীক্ষার ঠিক আগে মনে হলো, এই রকম অবস্থা চললে আমি পরীক্ষায় গাড্ডু পাবো। আজ রাত থেকে পড়াশুনো না করলে আর নিস্তার নেই। বিকেলবেলা কলেজ ম্যাগাজিনটা অন্য কাগজে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম গঙ্গার ধারে। নিরালায় দাঁড়িয়ে নিজের গল্পের পাতাটা খুললাম। এর আগে অন্তত তিরিশবার পড়েছি। একত্রিশতমবারেও মনে হলো, কি খারাপ লেখা! একটা বাঁদরের হাতে কলম দিলেও বোধহয় সে এর চেয়ে ভালো গল্প লিখতে পারবে।

ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে। দু-এক পলকের মধ্যেই সেটা কোথায় মিলিয়ে গেল। বিদায়, আর ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আর কোনোদিন ওকে মনে স্থান দেবো না।

আমাদের কলকাতার গঙ্গার ধারের সূর্যাস্ত—পৃথিবীর বিখ্যাত দৃশ্যগুলির অন্যতম। সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আকাশের একটা দিক গনগনে লাল—শেষ রশ্মিগুলি আলাদা-আলাদা হয়ে পড়েছে জলে—হঠাৎ একটা ষ্টিমারের ভোঁ বেজে ওঠে। সব কিছু বিষণ্ণ মনে হয়। কিংবা আমিই শুধু বিষণ্ণ। এই সৌন্দর্যরাশির

মধ্যে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, যে থার্ড হয়েছে। থার্ড। যার নিজের যোগ্যতা বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। যারা থার্ড হয়.. তাদের জীবনে আর কিছুই হয় না।

সেই সময়কার আকাশের দিকে তাকালে সন্ধ্যাশ্রী আর সূর্যদার নাম মনে পড়বেই। আর এক বিকেলে সন্ধাশ্রীর বাদাম খাওয়া আর সূর্যদার আগমন—সেই উপলক্ষ্য করেই তো আমার এই অধঃপাত। সন্ধ্যাশ্রী কিংবা সূর্যদার সামনাসামনি গিয়ে কোনোদিন হয়তো ক্ষমা চাইতে পারবনা—তাই সন্ধ্যাকালীন আকাশের দিকে তাকিয়েই আমি বলি, সন্ধ্যাশ্রী তুমি আমায় ক্ষমা করো। মরীচিমালি সূর্যের উদ্দেশ্যে আমি বলি, সূর্যদা ক্ষমা করবেন আমাকে।

মানুষের বদলে প্রকৃতির কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করলে এক ধরনের চমৎকার সান্ত্বনা পাওয়া যায়। অন্তত আমি সেদিন পেয়েছিলাম। তাই ঘটনাটা মনে আছে।

৩

নিশানাথ রায় একজন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় যুবা। অধুনা তিনি পাঁচ বৎসর বিলাতে প্রবাসী। 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' বা বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট নামক বিদ্যা অধ্যয়নে ব্যস্ত। এখানে তাঁর লেখা তিনটি চিঠি উদ্ধৃত করা হল। অপরের চিঠি পাঠ করা গর্হিত কাজ কিন্তু আমরা পাঠকদের অনুমতি দিলাম।

অভিভাবককে চিঠি

শ্রদ্ধেয় মামাবাবু,

কয়েক সপ্তাহ আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। আমার শরীর ভালোই আছে, কোনো রকম চিন্তা করবেন না সেজন্য। সম্প্রতি আমি বাসা বদল করেছি, সেইজন্য কিছুটা ব্যস্ত ছিলাম।

আমার নতুন বাসা আমার কলেজের খুব কাছেই। এই কয়েক-দিনেই ল্যাণ্ডলেডি আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। সত্যি ভদ্রমহিলার তুলনা হয় না, ঠিক আমার মায়ের মতো, এখানে উনি আমার মায়ের অভাব পূরণ করলেন। ওঁর নাম মিসেস কুক্, বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কোনো সন্তান নেই। মিসেস কুকের কোনো অর্থের অভাব ছিল না, শুধু নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যই বাড়িতে পেয়িং গেসট রাখছেন, এখন পর্যন্ত আমিই একমাত্র। আমাকে পেয়ে ওঁরও নাকি সন্তানের অভাব ঘুচেছে। উনি বলেন, আমার মতো ছেলে নাকি উনি কখনও দেখেননি। আমি প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে থাকি, বন্ধুবান্ধব এসে হৈহল্লা করে না, কারুর সঙ্গে বিশেষ আড্ডা মারি না, নিজের ঘরে চুপচাপ বসে পড়াশুনা করি—এতে উনি খুব অবাক হয়ে যান। আমি এখনও বিলিতি আদব কায়দা

রপ্ত করিনি, এখন পর্যন্ত গোমাংস খাইনি—এসব দেখে আমার প্রতি ওঁর স্নেহ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। উনি সব সময় আমাকে এমন যত্ন করেন যে, আমি কোনোরকম অভাব বোধ করিনি এখানে।

আপনারা সব কেমন আছেন? মা কেমন আছে? মাকে এবার পুজোর সময় আমার নাম করে একটি ভালো গরদের শাড়ী কিনে দেবেন। আমি এখান থেকে মায়ের জন্য কিছু পাঠালাম না—কারণ এখানকার বিলিতি কাপড়-চোপড় কোনোটাই হিন্দু বিধবার উপযুক্ত নয়। সুতরাং আপনি মাকে একটা গরদের শাড়ী কিনে দেবেন। আমি আপনার জন্য এবং মামীমা, শম্ভু, নিতু, রুমি ওদের জন্য জামা কাপড় পরে পাঠাবো। এখন আমার একটু টাকার টানাটানি যাচ্ছে।

পড়াশুনো নিয়ে এখন খুবই ব্যস্ত আছি। এবার যে-ভাবেই হোক পরীক্ষাটা শেষ করে দিতে হবে। পরীক্ষার জন্য ঠিক ভাবে পড়তে হলে আর অন্য কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না। আপনি লিখেছেন, পাঁচ বছর কেটে গেল—হয়তো আমার আর ফেরার ইচ্ছে নেই। কিন্তু মামাবাবু, যেখানেই যত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকি, নিজের দেশের মতন আর কি আছে? আমি যে এখানে এসেছি, সে-কি শুধু নিজের জন্য না দেশের গৌরব বাড়াতে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে। এখানে সব সময়ই দেশের সম্মানের কথা মনে থাকে। এখন যদি পরীক্ষা না পাস করেই ফিরে যাই, তবে সেট আমার দেশেরই অপমান। ইংরেজদের দেখাতে চাই--আমাদের দেশের লোকেরও সবকিছু করার যোগ্যতা আছে।

পরীক্ষা পাস করার পর আমার আর এ দেশে এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই। কিন্তু পরীক্ষা পাস করতে হলে আমার আর অন্য কিছু কাজ করার কথা ভাবলে চলবে না এখন। অথচ টাকারও খুব টানাটানি। ইচ্ছে করলেই চাকরি পেতে পারি—কিন্তু চাকরি করে এ দেশে পরীক্ষা পাস করা যায় না। সুতরা

আপনি কিছু টাকা পাঠাতে পারবেন কি? অন্তত হাজার তিনেক। আপনার নিজের কাছে যদি টাকা এখন না থাকে—তবে মাকে বলবেন আমাদের বেহালার বাড়িটা যেন বিক্রী করে দেন। মা-তো আপনার কাছেই আছেন—সুতরাং ও বাড়ি থেকে লাভ কি? আমি ফিরে গিয়ে ওর চেয়ে ঢের ভালো বাড়ি বানিয়ে দেবো। টাকাটা পাঠাবার জন্য যদি ফরেন এক্সচেনজ না পান, তা হলে অন্য উপায় আছে। সেটা আগামীবার জানাবো। মোটকথা টাকার আমার খুবই দরকার।

আপনারা সকলে আমার প্রণাম নেবেন। ছোটদের আশীর্বাদ!

ইতি

আপনাদের স্নেহের নিশি

বন্ধুকে চিঠি

রবি,

তোর চাকরির উন্নতি হবার খবর জানিয়ে চিঠি দিয়েছিস। মনে হল, এই উন্নতিতে তুই খুব আনন্দিত। রাস্‌কেল, তোর লজ্জা করলো না? আহ্লাদে ডগমগো হয়ে তুই আবার এ কথা আমাকে লিখেছিস! আগে পেতিস চারশো বিশ, এখন পাবি পাঁচশো বিশ এর নাম উন্নতি? তোর মতো একটা ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া এনজিনিয়ার দুর্গাপুরের গরমে পচে মরছে। কতবার তোকে বলেছি, এদেশে চলে আয়! আমার মতো ছেলেও এখানে করে খাচ্ছে, আর তুই একটা ব্রিলিয়াণ্ট্‌ ছেলে, ইস্কুলে-কলেজে তুই ছিলি আগাগোড়া ফার্স্ট বয়, আর তোর কিনা এই দশা! পাঁচশো কুড়ি টাকার নাম উন্নতি! আরে, ও টাকা তো আমি এক সপ্তাহে খরচ করি।

কি করবি ওখানে পড়ে থেকে? দেশের সেবা? ওসব বড় বড় কথা ঢের শুনেছি। আমি বাবা সার বুঝেছি, যে লাইফটাকে

এন্‌জয় করতে হবে। তার জন্য এরকম জায়গা আর হয় না। খাও-দাও স্ফুর্তি করো। ইচ্ছে হলে বেড়াতে যাও, প্যারিসে—প্লেনে চাপলে মাত্র এক ঘণ্টা জার্নি—সেখানে তো আনন্দের ফোয়ারা। আমি এখানে এসে দেড় বছরের মধ্যেই পরীক্ষায় পাস করে ডিগ্রী পেয়ে গেছি, খুব সোজা এখানে পাস করা। এখন একটা চাকরি ধরছি আর ছাড়চি। এখন পাচ্ছি উইকে আটচল্লিশ পাউণ্ড—অঙ্ক তো ভালো জানিস—কত টাকা হয় মাসে, হিসেব করে দেখ। আমি আর দেশে ফিরছি না।

তুই জিজ্ঞেস করেছিস, আমি গোপনে বিয়ে করেছি কিনা! এখানে এসে বিয়ে করে কোন গর্ধব! অবশ্য, সে রকম গর্ধব অনেক আছে আর যদি বিয়েই করি তবে গোপনে কেন? কাকে তোয়াক্কা করি আমি? তবে করিনি এখনও বিয়ে, ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিন করতে পারি। এখন বুঝলি না, হাঃ হাঃ···এ নিউ লাভ ইন এভ্‌রি উইক এন্‌ড···আমার ল্যান্‌ডলেডির মেয়েটা অবশ্য বিয়ে করার জন্য খুব ফাঁদ পেতেছে—বুড়ি ল্যান্‌ডলেডিটা নানান ছুতোয় ঘন ঘন ওর মেয়েকে আমার ঘরে পাঠায়, কিন্তু ও ঘুরছে ডালে ডালে আমি ঘুরি পাতায় পাতায়। মুখে ভাব দেখাচ্ছি যেন আমি একেবারে ধরা পড়ে গেছি—এদিকে বাড়ি বদলাবার তালে আছি গোপনে। কেন জানি না, এখানকার সব মেয়েরাই আমাকে খুব পছন্দ করে। আমার গায়ের রঙের জন্য তোরা আমাকে বলতিস কালোমানিক। অথচ, এখানে সবাই বলে, লাভ্‌লি। আমি চমৎকার আছি ভাই। তুই যদি ঐ দুর্গাপুরের গরমেই সারা জীবন পচতে চাস—তো তাই থাক। ভাবছি, সামনের বছর একবার আমেরিকাটা ঘুরে আসবো। ওখান থেকেও একটা চাকরির অফার পেয়েছি। দেখা যাক্‌। মাঝে মাঝে চিঠি দিস।

ইতি—

তোর নিশি

বন্ধুর দাদার চিঠি

অরুণদা,

আপনি আমাকে হয়তো চিনতে পারবেন না। আপনার ছোট ভাই তরুণ আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে আমি দেওঘরের বিদ্যাপিঠে কয়েক বছর পড়েছি। তরুণ এখন জেনেভায় আছে কিছুদিন আগে লন্ডনে ওর সঙ্গে দেখা হলো, ওর মুখেই শুনলুম, আপনিআমেরিকার ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত হয়ে তিন বছরের জন্য শিশু মনস্তত্ত্বের গবেষক নিযুক্ত হয়েছেন এবং গত বছর থেকে ওখানেই আছেন।

আপনাকে আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে এই চিঠি লিখছি। আমি গত পাঁচ বছর ধরে ইংলনডে আছি, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি। আমি বিজনেস ম্যানেজমেন্টর একটা কোর্স নিয়েছিলাম, কিন্তু প্রথমবার পাস করতে পারিনি। তারপর থেকে আমার আর ক্লাশে ভর্তি হওয়াই হয়নি। আমার ফরেন একসচেনজ ফুরিয়ে যায়, বাড়ি থেকে টাকা আসাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়েই আমাকে চাকরি নিতে হয়। এবং আপনি তো জানেন চাকরি করতে করত পরীক্ষা পাস করা কত শক্ত। বিশেষতঃ ভদ্রগোছের চাকরিও আমি পাইনি—গোঁড়ার দিকে দু'একটি হোটেল রেস্টুরেনেট বয়ের চাকরি করতাম, এখন একটি লাইব্রেরীতে কাজ করি, খুব পরিশ্রম করতে হয়, লাইব্রেরীয়ানের সমস্ত কাজই করতে হয় আমাকে— কিন্তু মাইনে পাই পিওনের সমান। এখানে চাকরির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয়দের এরা নিগ্রোদের সমানই ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আজকাল টেকনিক্যাল লাইন ছেড়ে—আর যে কোনো ভদ্রগোছের পথ একেবারেই বন্ধ এখন এক বন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে অতি কষ্টে আছি। দিন চলা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। সেদিন প্যাডিংটন রেল স্টেশনে কয়েকটি ইংরেজ ছেলে হঠাৎ পায়ে পা লাগিয়েই যেন ইচ্ছে করেই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। আমার বন্ধুটির চোখে এমন

ঘুষি মেরেছে যে ও এখন হাসপাতালে, একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায় কিনা ঠিক নেই। অন্য সকলে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল—কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলছিল, নিগারস্ গো হোম। রাগে অপমানে সর্ব শরীর জ্বলছিল আমার। ইচ্ছে করছিল এক্ষুণি এ দেশ ছেড়ে চলে যাই। অথচ যাই বা কি করে ?

অরুণদা আপনাকে একটা বিশেষ অনুরোধ জানিয়েই এই চিঠি লিখছি। আপনি যদি আমেরিকাতে আমার জন্য কোনরকম একটা কাজ ঠিক করে দিতে পারেন, তবে আমি যে কোন উপায়ে ওখানে চলে যেতে পারি। আপনি না বলতে পারবেন না। এটা আপনাকে করে দিতেই হবে। আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। আপনি হয়তো বলবেন দেশে ফিরে যাচ্ছি না কেন ? কোন মুখ নিয়ে যাব বলুন ? বিলেতে এলাম একটা কোনো ডিগ্ রী না নিয়ে কি ফেরা যায় ? তাহলে যে আমাকে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে হবে। আমি পড়াশুনোয় খুব খারাপ ছেলে নই, আরেকবার পড়ার সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই পাস করতে পারতুম। কিন্তু প্রথমবার অবহেলা করে এখন আমি এক চক্রের মধ্যে পড়ে গেছি, চাকরি ছেড়ে পড়াশুনো করতে গেলে আমি খেতে পাবো না। আর পড়াশুনো না করলে—এই সামান্য চাকরিতেই কি জীবন কাটবে ? অরুণদা, আপনি দয়া করে আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখবেন। আপনি যে-কোনা একটা ব্যাবস্থা করে দিলে আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

আপনার চিঠির প্রতীক্ষায় দিন গুণবো। আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—

নিশানাথ রায়

এই তিনখানি চিঠি একই সন্ধ্যেবেলা লেখা।

৪

জানলাটা দিয়ে আগে প্রকৃতির শোভা দেখেছিলাম খানিকক্ষণ। সেই জানলাটা পরে বেশ কাজে লাগলো।

জানলাটার পাশে কিছু আগাছার জঙ্গল, তারপর বাঁশবন, তারপর কতকগুলো বড় বড় আমগাছ। বাঁশ বাগানের মাথার ওপর—না চাঁদ ওঠেনি তখন, কারণ সময়টা সকাল, তবে সূর্যের ঝিকিমিকি মুখ দেখেছিলাম। বাঁকুড়ার খুব ভেতরের দিকে একটা গ্রাম। আমার এক বন্ধুর পিসীমার বাড়ি।

মুড়ি, ডিম ভাজা আর চা দিয়ে চমৎকার জলখাবার খেয়েছি, সঙ্গে বাড়ির উঠোনের গাছ থেকে সদ্য তুলে আনা কাঁচা লঙ্কা। বস্তুত এত উপাদেয় জলখাবার কলকাতায় রোজ সকালে আমার জোটে না। কিন্তু বন্ধুর পিসীমা আমাকে খাতির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতার ছেলে তো তারা রোজ সকালেই সন্দেশ রসগোল্লা খায়! গ্রামে চট করে রসগোল্লা সন্দেশ পাওয়া মুশকিল, তবু তিনি আমাকে মিষ্টি খাওয়াবেনই, তিনি তিলের নাড়ু তৈরী করতে শুরু করলেন।

রসগোল্লা সন্দেশজাতীয় বস্তুগুলো কোনোদিনই আমার প্রিয় নয়, হয়তো আঁতুড় ঘরে আমার ঠোঁটে মধু দেওয়া হয়নি বলে, কোনো মিষ্টি জিনিসই ভালো লাগে না। অন্য অনেক কিছুই আমার ঠোঁটে মিষ্টি লাগে কিন্তু জিনিস নয়।

—এ কি পিসিমা এত ?

—খাও বাবা, খেয়ে ছাখো!

পিসিমা আমার সামনে একটা ঝকঝকে কাঁসার থালায় রাজভোগ সাইজের ছ'টি তিলের নাড়ু রেখেছেন। বন্ধুটি তখন গেছে গ্রামের অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ সেরে আসতে, আমি

একা। আমি যতই বলি, পিসিমা, আমি এত খেতে পারবো না—তিনি বলতে লাগলেন, খেয়ে ছাখো বাবা গ্রামের টাটকা জিনিস—এ আর তোমাদের শহুরে দোকানের ভ্যাজাল নয়—পিসির হাতে তৈরী করা—

শহরের ছেলে হয়ে গ্রামের জিনিস অবজ্ঞা করতে নেই। তা ছাড়া বন্ধুর পিসিমা সত্যিই খুব ভালো মানুষ, এত আন্তরিকভাবে বলছেন। এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

একটা তিলের নাড়ু মুখে দিয়েই আমার প্রায় বাপরে মারে বলে চেঁচিয়ে ওঠার অবস্থা। এরকম বাঘা মিষ্টি আমি সারা জীবনে খাইনি। মানুষ অনেক করতে পারে, ব্যথা সহ্য করাও অসম্ভব নয়, কিন্তু অপ্রিয় খাদ্য গলাধঃকরণ করা অসম্ভব, বমি এসে যায়।

পিসি রান্নাঘরে গেছেন, একটা নাড়ু হাতে করে সেই জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আধখানাও শেষ করতে পারিনি। হঠাৎ বমি করে ফেললে পিসিমা ভাববেন কি? কখনো কখনো স্নেহ বা সততা থেকেও কি বিপদ ঘনিয়ে আসে!

জানলাটার বাইরে কতকগুলো কাক কি নিয়ে যেন খুব ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। জানলাটা বেশ উঁচু, বাইরের গাছপালাই চোখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না। কি অনুপ্রেরণা এসে গেল আমার মধ্যে, নাড়ুটা আমি ছুঁড়ে দিলাম বাইরে। কাকগুলো প্রথম উড়ে পালালো, তারপর আবার ফিরে এলো আস্তে আস্তে, প্রথমে একটা এসে নাড়ুটাকে শুকে দেখলো বোধ হয়। তারপর ওরা নিজেদের মধ্যে আবার ঐ নাড়ুটাকে নিয়েই ঝগড়া বাধিয়ে দিল।

আমি ভালো করে দেখে নিলাম। পিসিমা ধারে কাছে আছেন কিনা। পিসিমা রান্নাঘরে। আমি নাড়ুগুলোর সদগতি করলাম, একটার পর একটা ছুঁড়ে দিলাম বাঁশবাগানের দিকে। কাকগুলোকে খাটাবার জন্য আমি এক একটা ছুঁড়তে লাগলাম এক এক দিকে। তারপর এক গ্লাস জল খেয়ে সত্যিকারের তৃপ্তি।

খানিকটা বাদে পিসিমা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি, খেয়েছো? কেমন লাগলো?

কি উত্তর দেওয়া উচিত আমার? শহরের ছেলে হয়ে কি গ্রামের জিনিস নিন্দে করা উচিত? আমি বললাম, চমৎকার হয়েছে পিসিমা। অপূর্ব। অনেকদিন এ সব খাইনি।

পিসিমা আমার শূন্য রেকাবির দিকে তাকালেন। যে ছেলে একটু আগে ছ'টা নাড়ু দেখে ইস, এতগুলো বলে আঁতকে উঠেছিল, সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ক'টা শেষ করে ফেলেছে। তা হলে সে নিশ্চয়ই নকল-বিনয়ী? ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় সবগুলো কাককে খাইয়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি, দু একটা রেখে দেওয়া উচিত ছিল রেকাবিতে!

পিসিমা একমুখ হেসে বললেন, ভালো লেগেছে, তাহলে আর দুটো খাও!

—না, না, পিসিমা আর খাওয়া অসম্ভব।

—আর দুটো খাও, আমি অনেক বানিয়েছি।

—সত্যি, ভীষণ পেট ভরে গেছে, কিছুতেই আর পারবো না।

আমি তখন পিসিমার পা ধরতেও রাজী ছিলুম। কিন্তু পিসিমা কিছুতেই শুনলেন না। যে পাঁচ মিনিটে সব শেষ করে ফেলেছে, সে আর খাবে না, বললেই হলো। পিসিমা বললেন, তোমার পিসেমশাই তো এ রকম দশ-পনেরোটা নাড়ু গল্প করতে করতে খেয়ে ফেলেন, আর তুমি জোয়ান ছেলে পারবে না?

পিসিমা আবার চারখানা নাড়ু নিয়ে এলেন। আমি বিমর্ষ মুখে বললাম, পিসিমা, আর এক গেলাস জল লাগবে। পিসিমা জল নিয়ে আসবার আগেই আমি একটা নাড়ু জানলা দিয়ে বাইরে চালান দিয়ে দিলুম। এইটুকু সময়ের মধ্যে চার চারটে নাড়ু খতম করে দেওয়া বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। তাহলে নিশ্চয়ই আরও এক ডজন দেবেনই।

জল নিয়ে এসে পিসিমা আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন,

এতক্ষণ তিনি রান্না ঘরে ছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি—আফশোস করলেন সে জন্য।

আমি কথা বলতে বলতে নাড়ুগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। ভয়ে ভয়ে একটা মুখে তুলে আরও অসহ্য মিষ্টি বলে মনে হলো। তিলের থেকে গুড়ের ভাগই বেশি—এবং বড়িতে তৈরী গুড় যে এত মিষ্টি হয় আমার ধারণাই ছিল না। এর আস্ত একটা নাড়ু খেয়ে ফেললে আমার বমি হওয়া কে আটকায়!

কথায় কথায় বুঝতে পারলুম, পিসিমার নিজের হাতে তৈরী খাবার-টাবারের ওপর বেশ দুর্বলতা আছে। তাঁর হাতের খাবার খেয়ে কার কিরকম লাগলো—সেই দিয়েই তিনি মানুষের ভালো-মন্দ পছন্দ করেন। অনেক লোক যেমন ঝাল খেতে পারে না একেবারেই তেমনি অনেক লোক যে মিষ্টিও খেতে পারে না এটা পিসিমার কল্পনার বাইরে। বেশ একটু ভালো মানুষ, সাধু প্রকৃতির লোকেরাই মিষ্টি বেশী খায়—আমি রজঃগুণসম্পন্ন লোক—ঝাল-টালই আমার পছন্দ।

আমি হঠাৎ প্রকৃতি-প্রেমিক হয়ে বললাম, পিসিমা কি সুন্দর আপনাদের বাড়িটা। চারদিকে কত গাছপালা।

পিসিমা বললেন, ঐ গাছপালাই তো আছে। আর কি আছে এই পাড়াগাঁয়ে। কিছু পাওয়া যায় না, একটা কথা বলার মানুষ নেই।

—আমাদের কিন্তু বেশ ভাল লাগে এখানে এসে। যাই, একটু আপনাদের বাড়ির চার পাশটা ঘুরে দেখে আসি।

পিসিমার চোখের আড়াল হবার এই সুযোগ পেয়ে আমি রেকাবি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা গিয়েই এদিক ওদিক ছুঁড়ে দিলাম নাড়ুগুলো।

মনে মনে একটু অপরাধ বোধ জেগে উঠল। কিন্তু উপায় কি? আমি অনেকবার না বলেছিলাম, পিসিমা শোনেননি। ওঁর হাতের তৈরী করা জিনিস কেউ না খেলে উনি খুব দুঃখিত হন—অথচ এত মিষ্টি খাওয়া আমার পক্ষে শারীরিকভাবেই সম্ভব নয়।

পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো দুপুরবেলা খেতে বসে। ি একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আমার বন্ধুটি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে অনেক্ষণ গ্রামের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলো, আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না, তাই যোগ না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। একটু বাদে পিসেমশাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, কেমন লাগছে আমাদের গ্রাম ?

আমি অতি উৎসাহের সঙ্গে অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলাম ; কিন্তু পিসেমশাই বাধা দিয়ে বললেন, না, না, ও শহর থেকে এক দিনের জন্য বেড়াতে এসে ভালো লাগে। কিন্তু গ্রামের আছে কি ? গ্রাম গুলো সব ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে !

তারপর তিনি গ্রামের একটা বাস্তব করুণ ছবি তুলে ধরলেন আমার সামনে। অনেক সমস্যা, অনেক জটিল রাজনীতি। একটু-ক্ষণ বাদে বললেন, এখানে খাবার-দাবারও কিছু পাওয়া যায় না। তোমার নিশ্চয়ই খেতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম, না, না, কষ্ট কি বলছেন ? এমন টাটকা মাছ, তরিতরকারির স্বাদ —

গ্রামের টাটকা মাছ বা ভালো তরিতরকারিও কিছু পাওয়া যায় না। একদিন গ্রামের বাজারে গিয়ে দেখো ! ওসব ভুল ধারণা, সব ভালো জিনিস পাইকাররা নিয়ে যায় শহরের বাজারে। আমি একদিন গড়িয়াহাট বাজারে গিয়ে দেখেছিলাম, বেশ বড় বড় পোনা মাছ জলের মধ্যে জ্যান্ত রাখা আছে। গ্রামের বাজারে ওরকম মাছ বহুদিন ওঠেনি। কলকাতার লোকই বেশী টাটকা জিনিস খেতে পায়।

দুপুরের আহার্য দ্রব্য আমার সত্যি খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু পিসেমশাই কিছুতেই সেগুলোকে সুখাদ্য বলে মানতে চান না। তাঁর দৃঢ় ধারণা, শহরের লোকই ভালো ভালো খাবার খায়। তখন আমি মরীয়া হয়ে বললুম, কিন্তু সকালে যে পিসিমার তৈরী তিলের নাড়ু খেলাম, শহরে কি এসব পাওয়া যায় ? বহুদিন এমন চমৎকার জিনিস খাইনি।

পিসিমা কাছেই বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলেন। তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একটু মিথ্যে কথা বলে কারুকে যদি এমন খুশী করা যায় সেটা কি অপরাধ?

সন্ধ্যেবেলা সেখান থেকে বিদায় নিলাম। পিসিমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর যাবার পর বন্ধু বললো, নাড়ুগুলো এত জোর ছুঁড়ছিলি, আর একটু হলে আমার কপাল ফেটে যেত!

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বন্ধুটি বললো, আমি আর পিসেমশাই বাঁশ বাগানে বসেছিলাম, পিসেমশাই বাঁশগুলো বিক্রী করবেন—সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি পটাপট করে নাড়ু বৃষ্টি হচ্ছে! একটা তো আমার বুকে এসেই লাগলো। অত জোরে কেউ ছোঁড়ে?

আমার তখন ধরণী দ্বিধা হও গোছের মনের অবস্থা। বন্ধুটি আমার কাঁধ চাপড়ে বললো, চল, লজ্জার কিছু নেই! ওরকম হয়। বালিগঞ্জে এক বাড়িতে আমাকেও একদিন এমন অখাদ্য চা দিয়েছিল যে, আমি অন্যের অলক্ষ্যে সবটা চা ফ্লাওয়ার ভাসে ঢেলে দিয়েছিলাম!

৫

কোনো এক প্রাজ্ঞব্যক্তি, মনে নেই, ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে মানুষ জাতির একমাত্র পোশাক হবে প্যান্ট-সার্ট-কোট এবং সকলের বোধগম্য একমাত্র ভাষা হবে ইংরেজি। ঐ ভবিষ্যৎবাণীটি আমি পাঠ করেছিলাম বছর দশেক আগে একটি বিদেশী পত্রিকায়। এখন আমার মনে হচ্ছে, পঞ্চাশ বছরের দরকার নেই, সেই রকম অবস্থা এর মধ্যেই

অনেকটা এসে গেছে। এখন একজন জাপানী কিংবা একজন আফ্রিকান প্লেনে পাশাপাশি সীটে বসে থাকার সময় প্যাণ্ট সার্ট পরেই থাকে এবং তারা ইংরেজিতে কথা বলে। একজন বেদুইন যখন সামান্য আলোকপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লেখা পড়া শেখে—সে আলখাল্লা ছেড়ে অমনি প্যাণ্ট সার্ট বেছে নেয় এবং ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করে। এ রকম একমাত্র বেদুইনকে আমিই সত্যিই দেখেছি। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা (এখন যাদের বলে ইনজান) শুধু হলিউডের সিনেমার শুটিং-এর সময় পালকের মুকুট-টুকুট সমেত তাদের নিজস্ব পোশাক পরে নেয়, অন্য সব সময়ে তারা প্যাণ্ট-শার্টেই সজ্জিত।

আমাদের দেশে আজকাল ধুতি ক'জন পরে? আমার থেকে যারা বয়সে বড়, তাদের মধ্যে অনেককে এখনও ধুতি পরতে দেখি বটে কিন্তু আমার চেয়ে কম বয়েসীদের মধ্যে ধুতি-পরা ছেলে প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। অল্প বয়েসী কারুকে হঠাৎ একদিন ধুতি পরতে দেখলেই আমরা জিজ্ঞেস করি, কি আজ নেমন্তন্ন আছে বুঝি?

সামাজিক নেমন্তন্নতে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যাওয়া এই সেদিন পর্যন্ত রেওয়াজ ছিল। যে-সব বাঙালীবাবু অফিসের বড় সাহেব, তাঁরাও ঐ সব নেমন্তন্নর দিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্যুট-টাই খুলে ধুতি ফুতি পরে নিতেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও ধুতিটা অনেকটা বাধ্যতামূলক ছিল। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে প্যাণ্ট পরা গায়ককে দেখা এক অকল্পনীয় ব্যাপার। আমার বেশ মনে আছে শতবার্ষিকীর বছর মহাজাতি সদনের এক অনুষ্ঠানে কয়েকজন আধুনিক কবি যেই কবিতা পাঠ করতে মঞ্চে এলেন অমনি হৈ হৈ করে উঠলেন দর্শকরা। কয়েকজন নাকি ঐ কবিদের মারতেও চেয়েছিলেন। অপরাধ? কবিগুরুর অনুষ্ঠানে ওরা প্যাণ্ট পরে এসে কবিগুরুকে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন।

এখন অতটা কড়কড়ি নেই। প্যাণ্ট পরা গায়ক এখনো দেখা না গেলেও প্যাণ্ট পরা কবিতা-পাঠক অহরহ দেখা যায়। বিয়ে

অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নতে প্যাণ্ট পরে গেলে কেউ আর ছি ছি করে না। কি করব, সোজা অফিস থেকে চলে আসতে হলো—এইটুকু কেউ কেউ বলে, অনেকে বলে না। অনেকে ধুতি পরতে একেবারেই শেখে নি। আমার এক বন্ধু, বিয়ের সময় তাকে ধুতি পরাবার জন্য, আগে থেকে তিনজন লোককে ঠিক করে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও সে সিল্কের পাঞ্জাবীর নীচে ধুতির ওপর কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে ভুল করে নি। হ্যাঁ, বিয়ের সময় ছেলেদের এইভাবে ধুতি পরতেই হয়—এর ব্যাতিক্রম আজ পর্যন্ত বাঙালীদের মধ্যে দেখিনি। এদিক থেকে বিহারীরা এক ধাপ এগিয়ে আছেন। ওখানকার কোনো কোনো বিয়েতে বর নতুন স্যুট বুটজুতো এবং মাথায় পাগড়ি বেঁধে যান।

যাই হোক ধুতির সপক্ষে কোনো ওকালতি করার কারণ আমি দেখি না। ধুতি যেতে বসেছে, যাক। প্রত্যেকদিন সাদা ধুতি পরা একটা নিছক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই না। ট্রামে-বাসে যাতায়াত, এমনকি পথে হাঁটার সময়ও ধুতির চেয়ে প্যাণ্ট অনেক বেশী সুবিধাজনক। এবং ধুতির চেয়ে প্যাণ্ট অনেক সস্তা। অনেকের ধারণা থাকতে পারে যে শুধু শহরের লোকেরাই প্যাণ্ট পরে, গ্রামে এখনো ধুতির প্রচলন আছে। ধারণাটা ভুল। প্রকৃত গ্রাম বলতে এখন কিছু নেই। গ্রামের ছেলে-ছোকরাও আজকাল প্যাণ্ট সার্টই পরে। আর যারা প্যাণ্ট পরে না তারা ধুতিও পরে না, তারা পরে নেংটি। এদের ধুতি কিংবা প্যাণ্ট কোনটাই কেনার সামর্থ্য নেই।

একদিন আমার বাড়ির বারান্দা থেকে সকালবেলা একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলাম। কয়েকজন প্যাণ্ট সার্ট পরা যুবক একটা রবারের চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা টেলিফোন কিংবা ইলেকট্রিক কম্পানির। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেরা বুঝি গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। পরের দিন সেই একই দৃশ্য দেখে আমি পুরো ব্যাপারটা

বুঝতে পারলাম। গোলমাল কিছুই হয়নি। কম্পানির লোকেরাই গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আগে যাদের রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে এই সব মেরামতের কাজ করতে দেখতাম, তাদের পরনে থাকতো নেংটি। এখন তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ায়, তারা ধুতি ধরেনি প্যাণ্ট সার্ট কিনেছে। খুব ভালো করেছে। পোশাকগুলো কোম্পানির দেওয়া নয়, কারণ নানা রকম।

প্যাণ্ট সার্টের মতন ইংরেজি ভাষাকেও আমাদের মেনে নিতেই হবে। ইংরেজি শুধু যে ক্রমশ পৃথিবীর একমাত্র যোগাযোগের ভাষা হয়ে উঠেছে, তাই-ই নয়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা শুধু ইংরেজি। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীকে নিয়ে যে যতই মাতামাতি করুক ইংরেজিকে কেউ ছাড়তে চায় নি। বরং ইংরেজির ইজ্জৎ দিন দিন বাড়ছে। সাহেবরা চলে যাবার পর এদেশে সাহেবের সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। এখনও প্রত্যেকটি অফিসেই বড়বাবুর চেয়ে বড় সাহেবের পদ-মর্যাদা অনেক বেশী, তা না বললেও চলে।

সুতরাং ইংরেজি যখন শিখতেই হবে, তখন ভালো করে শেখবার আকাঙ্খা জাগবেই। সেই কারণেই মিশনারি স্কুলগুলিতে ছেলে মেয়েকে ভর্তি করার জন্য আধুনিক মা বাবাদের যত আকুলি-বিকুলি। এই স্কুলগুলির সংখ্যা বেশী নয়, সেই জন্যই এই সব জায়গায় ভর্তির সময় যে সব করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়, তা হাস্যরসেরও যথেষ্ট খোরাক যোগাতে পারে।

যাই হোক, ইংরেজি শিখতে গেলে কষ্ট তো করতেই হবে। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে, ইংরেজি শেখা মানেই কি বিলেত আমেরিকার সংস্কৃতি গ্রহণ করা? একটা দেশের আসল সাংস্কৃতিক রূপটি বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না। বাইরে থেকে শুধু চোখে পড়ে চটকদার চোখ ধাঁধানো দিকটি, জামা কাপড়ের কায়দা, কাঁধ ঝাঁকানো কিংবা গানের সঙ্গে নাচ। এই ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে? ইংরেজি শিখতে গিয়ে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা

নিজের দেশের সংস্কৃতিও হারাচ্ছে আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও পুরো-পুরি শিখতে পারছে না। তার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার নিজস্ব চিন্তা শক্তি।

মিশনারি স্কুলগুলিতে শিক্ষা পদ্ধতি খুব ভালো। নিয়মানুবর্তিতা আছে। কিন্তু সেখানে একেবারে অতি নিচু ক্লাসের ছেলেও যখন প্রথম ইংরেজি শব্দ শিখতে আরম্ভ করে—তখনই তাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। পুলিসম্যান শব্দটি শিখে সে দেখে তার পড়ার বইতে লণ্ডনের পুলিসম্যানের ছবি! পিওন বলতে সে শেখে বিলেতে আমেরিকার মেইলম্যান বা পোষ্টম্যান। একটা গ্রামের বর্ণনা পড়তে গিয়ে তাকে পড়তে হয় স্কটল্যাণ্ডের একটি গ্রামের কথা। এখন থেকেই মগজ ধোলাই শুরু হয়ে যায়। কিছু ছেলে মেয়ে হয়তো এর আওতা থেকে পরবর্তী জীবনে বেরিয়ে আসতে পারে না কিন্তু বেশী সংখককে নিয়েই তো সমস্যা।

এই নিয়ে দুঃখ করারও অবশ্য কিছু নেই। সংরক্ষিত অরণ্য করেও যেমন বাঘ-সিংহ হরিণদের আর বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, তেমনি চেষ্টা করেও ধুতি কিংবা সংস্কৃতি' বাঁচানো যাবে না। সময়ের নিয়মে যা যাবার তা যাবেই।

আসলে আমি লিখতে চেয়েছিলাম হিন্দী সিনেমা সম্পর্কে বোমবাইয়ের ছবিগুলো যে একটা অদ্ভুত নির্বোধ এবং ফাঁকা জীবন চিত্রিত করে যাচ্ছে আর আমাদের এখানকার শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরাও পয়সা খরচ করে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে নিয়মিত সেগুলো দেখতে যাচ্ছে—এটাই আমার কাছে বিস্ময়কর লাগে। কষ্টও লাগে।

ঠিক গল্পের বইতে যে-রকম থাকে, সেই রকমভাবে মাঝ পথে আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। বেশ চলছিল গাড়িটা, হঠাৎ একটা বিসদৃশ আওয়াজ করলো। তারপর একটু খানি গড়িয়ে গিয়েই থেমে গেল। এর পরেই একেবারে নিঃশব্দ জড়পদার্থ।

যদিও গহন অরণ্য বা মরুভূমি বা মধ্যরাত্রি নয়—ব্যাপারটা ঘটলো বিকালবেলা এবং একটি বড় রাস্তায়, কলকাতা থেকে মাত্র মাইল পঞ্চাশেক দূরে তবু আমরা বেশ বেকায়দায় পড়লুম।

গল্পের বইতে যখন তখন গাড়ি থামে বটে কিন্তু আমরা গল্পের চরিত্র নয়। নেহাৎই পাঁচ বন্ধু দেড়দিনের জন্য বেড়াতে বেড়িয়ে তারপর কলকাতায় ফিরছিলাম। নারী চরিত্র ছাড়া কোন গল্প জমে না, আমাদের দলে কোন মেয়ে নেই এমনকি বন্ধুপত্নীও না। সুতরাং গল্পের মতন রোমাঞ্চিত হবার বদলে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠলুম বেশ খানিকটা।

হুগলি জেলায় এক গ্রামে আমাদের এক বন্ধুর পৈতৃক বাড়ি। সেখানে আমরা মাঝে মাঝে যাই। লোকাল ট্রেন বা বাসে চেপে সেখানে যাতায়াত করার বিড়ম্বনা অনেক—সেইজন্যই কোন বন্ধু যদি একটা গাড়ি যোগাড় করতে পারে, তাহলেই আমাদের ঐ গ্রামে বেড়াবার উৎসাহটা বেড়ে ওঠে। একটু ফাঁকা হাওয়ার নিশ্বাস, চাঁদের আলোয় এলোমেলো গ্রাম, নিজেদের মধ্যে কিছু লঘু উৎসব আর বড় জোর পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা—এইটুকুই অমাদের আকর্ষণ, আর কিছু না। কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে দেড় দিনের জন্য একটু সরে থাকা।

জানি, গ্রামে আছে অনেক সমস্যা, অনেক অনাচার ও দারিদ্র্যতা সেদিকে আমরা কখনো মাথা ঘামাইনি। শৌখিন দেশোদ্ধারকারীর ভূমিকা আমাদের কারুরই পছন্দ নয়।

আজকালকার দিশি মোটর গাড়ি যেখানে সেখানে যখন তখন খারাপ হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার কিছুই নয়—কিন্তু গাড়ি যদি মাঝ রাস্তাতেই খারাপ হবে, তাহলে কোন গল্প ঘটবে না কেন? আমাদের সন্ধে পেরতেই কলকাতায় ফেরার কথা, পরদিন সকালে প্রত্যেকেরই নানা রকম কাজ—রুটিন বাঁধা জীবন, এক চুল এদিক-ওদিক হলে চলে না। একমাত্র কোনো গল্পের মতন ঘটনা ঘটলেই রুটিনটা একটু বদলানো যেতে পারে।

গাড়ির বনেট তুলে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া হলো। বন্ধুরা সবাই ব্যস্ত। আমি গাড়ির কলকব্জা বিষয়ে কিছুই বুঝি না, সুতরাং আমার কোনো ভূমিকা নেই। ভেতরে বসে বসে পা দোলাতে লাগলুম। আর সিগারেট টানতে লাগলুম। মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যে-কোনো মুহূর্তেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করবে। এরকম হয়। আমি দেখেছি। গাড়ির মতি-গতির কোনো ঠিক নেই।

অনেক্ষণ বাদে বন্ধুরা আবিস্কার করলো যে কারবুরেটারের মধ্যে কি একটা ছোট স্প্রিং-এর যন্ত্র ভেঙে গেছে। সেই যন্ত্রটা নিয়ে এসে না লাগলে গাড়ি আর চলবেই না। খুবই দুঃসংবাদ।

যে রাস্তার ওপর আমরা আছি, সেটা একটা মর-রাস্তা। অনেক রাস্তা এরকম মরে যায়। এক সময় এটা বেশ ব্যস্ত রাস্তা ছিল, অনবরত গাড়ির আনাগোনা এবং দু' পাশে দোকানপাট ছিল। এখন এর ছ' মাইল দূরেই তৈরী হয়েছে ছ' নম্বর জাতীয় সড়ক, দোকান পাট সেখানেই উঠে গেছে—বেশীর ভাগ গাড়িই সে রাস্তায় যায়।

আমরা পথ সংক্ষেপ করার জন্য এ রাস্তা ধরেছিলাম। এদিকে ক্বচিৎ গাড়ি যায়। তবু কয়েকটা গাড়িকে থামিয়ে সাহায্য চাইলাম। কারুর কাছেই ঐ স্প্রিং-এর যন্ত্রটা অতিরিক্ত নেই। তবে, দু-মাইল দূরে জাতীয় সড়কে পৌঁছেতে পারলে, আরও দু-মাইল দূরে গ্যারাজ আছে।

একটি উপায় আছে, গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু আট মাইল গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। আট মাইল রাস্তা শুধু হাঁটতে তো আমরা ভুলে গেছি। তখন আর একটি উপায় বার করতে হলো। আমাদের মধ্যে দু'জন অন্য গাড়ি থামিয়ে লিফট চেয়ে জাতীয় সড়কে চলে যাবে। তারপর গ্যারাজ থেকে ঐ যন্ত্র এবং মিস্ত্রি ধরে আনবে।

দু'জনের বদলে ওরা তিনজনই চলে গেল। অন্য একটা চলন্ত গাড়িতে উঠে ওরা বললো, যদি ঐ পার্টসটা এখানে না পাই কিংবা মিস্ত্রি না পাই—তাহলে আমরা এখানে আর ফিরবো না। তোরা গাড়িটা পাহারা দিস।

—আমরা রাত্তিরে কোথায় থাকবো ?

—কেন, গাড়ির মধ্যে

এইরকম সময় রসিকতাও সত্যি বলে মনে হয়। যদি ওরা সত্যিই না ফেরে ? বাঘ-ভাল্লুক ভরা হিংস্র জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু হুগলী জেলার মাঠের মধ্যে রাত কাটাতে যাবো কোন দুঃখে ?

হুগলী জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্যও এমন কিছু বিখ্যাত নয়। আমরা যেখানে আছি, তার দু-পাশেই বিস্তৃত মাঠ। বাড়ি ঘর বিশেষ নেই। কিছু দূরে একটি চৌকো অট্টালিকা। দেখলেই চিনতে পারা যায়, কোল্ড স্টোরেজ। বাংলার অনেক নিভৃত গ্রামেও আজকাল এরকম কোল্ড স্টোরেজ চোখে পড়ে। শুনতে পাই, রাজস্থান, পাঞ্জাব বা গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীরা এসে এই সব কোল্ড স্টোরেজ খুলে বসেছে।

আমি আর হেমকান্তি কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখলাম। এই রকম সময় প্রকৃতিও এক ঘেয়ে লাগে। হেমকান্তি হাই তুলে বললো, যা বাবা ? সিগারেটের প্যাকেটটা ওরা নিয়ে গেল ?

আমি বললাম, আমার কাছে দু'তিনটে আছে।

—তারপর ? এগুলো ফুরিয়ে গেলে ?

আমি তখন ডান দিকের মাঠের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। হেমকান্তি আমার দৃষ্টি অনুসরণ করলো। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, হুঁ !

আমাদের কাহিনীতে এতক্ষণে একজন নায়িকার আবির্ভাব হয়েছে। দূরে মাঠের মধ্যে দিয়ে লাল শাড়ী পরে কেউ একজন হেঁটে আসছে। সে বালিকা না যুবতী না বৃদ্ধা তা এখনো বোঝা যায় না, তবে তার এত টকটকে লাল রঙের শাড়ী দেখে যুবতী হিসাবে কল্পনা করতেই ইচ্ছে হয়।

আমরা দু'জনেই ঐ চলমান লাল আগুনের শিখার মতন মূর্তিটির দিকে চেয়ে রইলাম। খুব বেশীক্ষণ মাঠ-ঘাট-আকাশ ইত্যাদি প্রকৃতি দেখার চেয়ে একটি জীবন্ত মেয়েকে দেখা যে অনেক স্বাস্থ্যকর, তা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন। আমাদের শাস্ত্রেও তো নারীকে প্রকৃতি বলেছে, তাই না ?

প্রথমে ভেবেছিলাম, মেয়েটি আমাদের দিক থেকে উল্টো দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তাতে একটু একটু নিরাশ বোধ করছিলাম। তারপর বুঝতে পারলাম, না সে আমাদের দিকেই আসছে। তাহলে ব্যাপারটা বেশ জমে উঠবে মনে হচ্ছে। হঠাৎ গাড়ি খারাপ হওয়ার ঘটনাটা বৃথা যাবে না।

কাছে আসবার পর বুঝতে পারলাম, যুবতী বা বৃদ্ধা নয়—মেয়েটিকে এখনো কিশোরীই বলা যায়। ষোল-সতেরোর বেশী বয়েস হবে না। পিঠের ওপর চুলগুলো খোলা, বিস্তীর্ণ মাঠের পটভূমিকায় তাকে বেশ সুশ্রী দেখাচ্ছে। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় হয়তো তার চেহারার থেকেও বেশী সুন্দর দেখায় তাকে।

মেয়েটি মাঠ থেকে উঠে এলো রাস্তায়। আমাদের গাড়ির খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বেশ সপ্রতিভ কৌতুহলের সঙ্গে চেয়ে রইলো। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, আমাদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে কিনা !

মেয়েটি এরপর একটা অবাক করা কথা বললো। আমাদের

চমকে দিয়ে সে বেশ জোরে বলে উঠলো, বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে। তারপরই মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগলো হন হন করে।

আমি আর হেমকান্তি হো-হো করে হেসে উঠলাম। হেমকান্তি বললো, ওরে বাবা, কি তেজী মেয়েরে, একেবারে ধানী লঙ্কার মতন!

আমি বললাম, জানিস, আজকাল অনেক গ্রামের মেয়েরা কো-এডুকেশনাল স্কুলে পড়ে? তারা অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে।

—মেয়েটা চলে গেল? আলাপ করতে পারলে বেশ হতো, সময়টা কাটতো।

—আমি এখানে আলাপ করতে পারি।

—যাঃ যাঃ! পাঁচ টাকা বাজি।

আমি বললাম, পাঁচ টাকায় হবে না। উৎসাহের চোটে হেমকান্তি কুড়ি টাকায় উঠলো। আমি তখন গাড়ি থেকে নামলাম।

আগে লক্ষ্য করিনি একটু দূরে, রাস্তার পাশে একটা ছোট পুকুর, পুকুর পাড়ে খেজুর গাছ ও বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে কয়েকটা বাড়ি মেয়েটি সেই পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে।

আমি সেখানে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দু-একটি কথা বলে ফিরে এলুম। মেয়েটি পুকুরের অন্য পারে চলে গেল।

হেমকান্তি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো? মেয়েটা চলে গেল যে।

আমি উত্তর না দিয়ে হাসলুম। হেমকান্তি একটু ভয় পেয়ে গেছে। মেয়েটা যে-রকম তেজী যদি ওর বাড়ির লোকদের ডেকে এনে আমাদের মার খাওয়ায়, যে-কোনো একটা মিথ্যে কথা বললেই তো হলো।

দু-তিন মিনিটের মধ্যেও কোনো লোক আমাদের মারতে এলো না। তখন হেমকান্তি বললো, তুই বাজি হেরে গেছিস! দে, টাকা দে।

—দাঁড়া, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

একটু বাদেই দেখা গেল, মেয়েটি আবার ফিরে আসছে।

একা। হাতে একটা পাত্র। আমাদের দিকেই যে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার আমি হেমকান্তিকে বললাম, নে টাকা বার কর। কে হেরেছে দেখলি?

হেমকান্তি খানিকটা মুষড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই কি বললি রে?

আমি বললাম, সত্যি কথা বলার তো বিপদ নেই। যা সত্যি কথা তাই ওকে বলেছি। আমার জল তেষ্টা পেয়েছিল, মেয়েটাকে গিয়ে বললাম, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াবেন? বাংলাদেশের গ্রামের অবস্থা এখনও এমন হয়নি; যাতে কোনো মেয়ের কাছে জল খেতে চাইলে সে আপত্তি করবে। আর, বাচ্চা মেয়েদের খুশী করার জন্য তাদের আপনি বলতে হয়।

মেয়েটি রাস্তার কাছে এসে বললো, এই যে নিন।

হেমকান্তি আর আমি ছুটে গেলাম। সোনার মতন উজ্জ্বল কাঁসার ঘটিতে সে জল এনেছে সঙ্গে একটা গেলাস। কি ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ জল: উৎসাহের চোটে আমরা দু' গেলাস করে খেয়ে ফেললাম।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলো আপনি তখন বললেন কেন, বেশ হয়েছে?

মেয়েটি বললো, আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই বলেছি। গাড়ি করে কেউ যখন বেড়াতে আসে, তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে আমার খুব অনন্দ হয়।

আমি বললুম, গাড়ি যদি না ঠিক হয়, তা হলে আমরা আজ রাত্তিরে আপনাদের বাড়িতে থাকবো কিন্তু! ভাত খাওয়াতে হবে! আমি এক দম খিদে সহ্য করতে পারি না।

পাঠক বুঝি ভাবছেন, এরপর আরও অনেক কিছু ঘটবে। আবার কি হবে? এ তো গল্প নয়। মিস্ত্রি নিয়ে আমাদের বন্ধুরা অবিলম্বে চলে এলো। দু' মিনিটে ঠিক হয়ে গেল গাড়ি। আমরা জল খেলাম, মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিলাম, চলে এলাম।

৭

আমেরিকার একটা খুব ছোট শহরে আমি কিছুদিন ছিলাম। আমার ঘরের জানালা দিয়ে পাশের একতলা বাড়িটার বারান্দা দেখা যেত। প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যেবেলা দেখতাম তিনটি বারো-তেরো বছর বয়সের মেয়ে এবং একটি প্রায় ঐ বয়েসী ছেলে ঐ বারান্দায় খেলা করছে। তখন গ্রীষ্মকাল, জানালা খোলা না রাখলে ঘরের মধ্যে দগ্ধে মরার সম্ভাবনা, জানলার পাশেই আমার পড়ার টেবিল, জানলা দিয়ে প্রায়ই আমার চোখ বাইরে চলে যেত, আমার পড়াশুনোয় বিঘ্ন ঘটাতো। দেখতাম, ওদের খেলার মধ্যে কি যেন একটা নিয়ম রয়েছে, কিছুক্ষণ হুটোপুটি করার পরই ছেলেটি এক একবার এক একটি মেয়েকে চুমু খাচ্ছে।

ওদেশে কোনো ছেলেমেয়েরই স্বাস্থ্য খারাপ নয়, যেমন সুন্দর গায়ের রং, তেমনি গড়ন, মাথা ভর্তি কোঁকড়া সোনালি চুল, ছেলেমেয়ে কটিকে দেখতে ভারী ভালো লাগে, স্কুলের ছাত্রছাত্রী ওরা—সেই সরল সজীবতাও রয়েছে ওদের কণ্ঠস্বরে, এর সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়ার দৃশ্যটা সব সময় মেলাতে পারিনি। কোনো রকম ভয় বা আড়ষ্টতা নেই, গোপনতার চেষ্টা নেই, যেন ওটা সত্যিই একটা খেলা, গুরুজনরা মাঝে মাঝে যাতায়াত করছেন বারান্দা দিয়ে—তাঁদের দেখে ওরাও ছিটকে সরে যাচ্ছে না, তাঁরাও কোনো মন্তব্য করছেন না।

কোনো সন্দেহ নেই, সব দেশের ছেলেমেয়েরাই ঐ বয়েসে পরস্পরের রহস্য জানার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে বাবা-মা'র কঠোর শাসনের আচরণ ভেদ করেও প্রায় সব ঐ বয়েসী ছেলেমেয়েই পরস্পরের শরীর একটু ছোঁয়াছুঁয়ি করে নেয়। তার সঙ্গে ওদের তফাৎ শুধু এই—ওরা জিনিসটাকে অন্যায় কিংবা

গাপন করার কথা ভাবছে না, অন্যদের সামনেই স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে
।ারছে—এবং অভিভাবকরাও প্রকাশ্যে অন্তত ও নিয়ে কোনো মাথা
।ামাচ্ছে না। জিনিসটার মধ্যে আমিও কোনোরকম অন্যায় দেখতে
।াইনি—তবুও কিছুতেই যেন সমর্থন করতে পারছিলুম না। মনে
চ্ছিল, এতটা স্পষ্টতা না থাকলেই বোধ হয় ভালো ছিল—আমরা
ছলেবেলায় যেমন করেছি, লুকিয়ে-চুরিয়ে শুধু একটু দেখা করার
রামাঞ্চ, আঙুলে-আঙুল ছোঁয়া, গোপনে চিঠি চালাচালি ও সব
ময় না-পাওয়ার আশঙ্কা বা দুঃখ—তার মধ্যে রহস্য ছিল অনেক-
।ানি—এরা সেই রহস্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জৈবিক তৃপ্তি আর
তখানি, শরীরের রহস্যটাই তো আসল।

মাস দেড়েক বাদে দেখলুম, সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সেই
সেই ছেলেটির সঙ্গে শুধু একটি মেয়ে—পরস্পরকে
লিঙ্গন করে তারা যেভাবে নিবিড় চুম্বনে রত, সেটাকে আর
াক্রমেই খেলা বলা চলে না। ঝটাপটি করতে করতে ছেলেটি
বুকে মুখ গুঁজলো। আমাদের দেশে কোনো প্রতিবেশীর
়খ এরকম দৃশ্য পড়লে—তখুনি ছুটে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে
, পাড়াময় কেচ্ছা, ছেলেমেয়ে দুটিকে প্রচুর ধমক, কিল চড়
ংবা খাওয়া বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখা চলতো। ওদেশে এসব
না, তাছাড়া আমি তো বিদেশী, আমার পক্ষে কিছু বলা মানায়
আমি একটা অজানা আশঙ্কা বোধ করতে লাগলুম। ওরা
়ল পথে এগুতে লাগলো ক্রমশ, প্রতিদিন টেলিভিশানে,
যে-সব দৃশ্য দেখছে, তার থেকে শিক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, সুতরাং
দিন মেয়েটির মা ও বাবা পার্টিতে নেমতন্ন খেতে গিয়েছিল—
দিন ছেলেটি-মেয়েটি চুম্বনাদি করতে করতে যে-রকম উন্মত্তের
ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো, তাতে পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কে
।ার মনে কোনো সন্দেহ রইলো না। আমি শিউরে উঠলুম।

অবশ্য, নিজেকে আমি প্রশ্ন করেছি, কেন আমার অস্বস্তি ও
শঙ্কা। একি এক ধরনের সংস্কার ও গোড়ামি নয়? তের-

চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের শারীরিক মিলন মোটেই অস্বাভাবিক বা অবৈজ্ঞানিক নয়, তাহলে প্রকৃতি তাদের শরীরকে প্রস্তুত করেছে কেন ? আমাদের ঠাকুর্দার বাবারা তো ও বয়সে বিয়ে করে দিব্যি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন—সুতরাং নিছক 'বিবাহ' নামের প্রতিষ্ঠানটিকেই কি একমাত্র গুরুত্ব দিতে হবে ? আমেরিকাতে, অনেক ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেকে বিবাহিত ও পিতা হিসেবে দেখেছি। অনেকের নানা পার্থিব কারণে বিবাহিত হয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়া সম্ভব হয় না, তাই বলে বছরের পর বছর শরীরের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত রাখতে হবে ? এর নৈতিক মূল্য থাকতে পারে—কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এটা অস্বাভাবিক, সুতরাং ছেলে-মেয়ে দুটির ওপর আমি রাগ করতে পারলুম না।

এরপর মাঝখানে কি ঘটেছিল জানি না, একদিন সকালে সেই মেয়েটির মৃতদেহ নদীর জলে ভাসতে দেখা গেল। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। ফুলের মতন সুন্দর একটি বাচ্চা মেয়ে স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছে প্রাণ। সেদিন আমি খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলুম। আমা মনে হয়েছিল, এইভাবেই আমেরিকার ধ্বংস আসবে। মানুষের যে-স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা এত উদগ্রীব, সেই স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপই আত্মধ্বংস ডেকে আনবে। সেই স্বাধীনতার নামে জায়গায় পৌঁচেছে আজকের পশ্চিমী সভ্যতা—আত্ম ধ্বংস ছাড়া তা আর নিস্কৃতি নেই।

বলাই বাহুল্য, ঐ ছেলেমেয়ে দুটির ব্যবহারকে পূর্ণ সমর্থ করাও যেমন যুক্তিহীন, তেমনি এদের মৃত্যুর মতই পশ্চিমী সভ্যতা মৃত্যু আসন্ন বলাও অতিশয়োক্তি। যৌন-স্বাধীনতার ভালো এব খারাপ দুটি দিকই অন্ধ না হলে, নজরে পড়ে।

আজকাল অনেকেই বলেন, লালসা, ব্যভিচার ও নোংরা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার ফলেই যেমন রোমের বিশাল সাম্রাজ্য সভ্যতার পতন হয়েছিল, এখনকার পশ্চিমী সভ্যতারও ধ্বংস ঘটবে। সেইজন্যই এখানকার সাহিত্যে, সঙ্গিতে, চিত্রে এ

যৌনতার বাড়াবাড়ি। ব্রিটেনের ম্যাল্‌কম ম্যাগারিজ কথাটাকে এইভাবে সাজিয়ে বলছেন, "It is the inevitable mark of decadence in our society. As our vitality ebbs people reach out for vicarious excitement, like the current sex mania in pop songs and the popular press, At the decline and fall of the Roman Empire, the works of Sappho, Catallus and Ovid were celebrated. There is an analogy in that for us." এই যৌন ব্যভিচার ও বল্গাহীন লালসা পশ্চিম জগতে কতখানি গেছে, তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়।

কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে দোকানে কনট্রাসেপটিভ পিল ও কনডোম বিক্রী করতে হবে এবং মেয়েদের হোস্টেলে ছাত্রদের দিনে-রাত্রে যে কোনো সময় যাওয়ার অধিকার থাকবে, ছাত্রদের এই দাবির জন্য ম্যালকম ম্যাগারিজ নিজে পদত্যাগ করেছিলেন। পশ্চিম জারমানিতে স্কুল কলেজের অবিবাহিত ছাত্রীদের মধ্যে প্রতি বছর ত্রিশ হাজার ছাত্রী গর্ভবতী হয়। সেইজন্যই অনেকেই মনে করেন, এরকম যখন হচ্ছেই, তখন তাদের কনট্রাসেপটিভ ব্যাবহার করতে দেওয়া বরং ভালো। আমেরিকায় আজকাল অনেক পরিবারেই মায়েরা প্রতিদিন সকালে চা ও টোস্টের সঙ্গে একটি করে কনট্রাসেপটিভ পিলও খেতে দেন নিজের অবিবাহিত মেয়েকে। ফরাসী অভিনেত্রী ক্যাথরীন ড্যানিয়ূবের একটি পুত্র জন্মেছে—তিনি বিয়ে করেন নি, এবং প্রকাশ্যে ছেলেটিকে নিয়ে আছেন এবং ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি বিয়ে করা পছন্দ রেন না। সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য ফরাসী যুবতী বিয়ে না করেই মা হয়ে ফ্যাশনেবল হতে চাইছেন। সুইডেনে নট্রাক্ট ম্যারেজের মতনই অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে না করে যতদিন একসঙ্গে থাকে, তারপর ইচ্ছে মতন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—এ সমাজও কোনো উচ্চবাচ্য করে না।

ইওরোপ আমেরিকায় প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শহরেই কতগুলো প্রাইভেট ক্লাব আছে। সেখানকার সব মেম্বাররাই বিবাহিত, মাসে একদিন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে সেই ক্লাবে আসেন, পান-আহারের পর আলো নিবিয়ে সদস্যরা প্রত্যেকেই নিজেদের স্ত্রীদের বদলাবদলি করে উপভোগ করেন। এই রকম ক্লাবের নানা রূপান্তর আছে, উদ্দেশ্য একই। কোনো রকম শিল্পের চিহ্নহীন স্ট্রিপটিজ ক্লাবের ছড়াছড়ি সর্বত্র। কোনো কোনো দেশে আইন আছে যে ষ্ট্রিপটিজের সময় নারীদেহের উর্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন করা গেলেও নিম্নাঙ্গের সব পোষাক খোলা চলবে না। এই আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য অনেক ক্লাবে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের একটি সেলোফেন কাগজের তৈরী নিম্নবাস পরিয়ে রাখা হয়। এতেও তো তৃপ্তি নেই— ষ্ট্রিপটিজ ক্লাবেও আর আজকাল ভিড় হয় না বলে, লস এঞ্জেলেসের অনেক জায়গায় ষ্ট্রিপটিজের সঙ্গে একটা কোনো নাম করা ফিল্মও ঘুষ দেওয়া হয়। হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডাম শহরকে বলা হচ্ছে সমকামীদের স্বর্গ। ওখানে পুরুষ বেশ্যার ছড়াছড়ি, অনেক হোটেলেই অল্পবয়েসী বালক জুটিয়ে দেবার বন্দোবস্ত আছে। সারা পৃথিবী থেকেই দু' জাতের সমকামীরা আমস্টার্ডামে ভিড় করে। হল্যাণ্ডের সরকার এ সম্পর্কে অবহিত হবার পর পুলিশী কড়াকড়ি শুরু হয়। কিন্তু তারপরই ওদেশে টুরিষ্টের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাওয়ায়—সরকার আবার চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ঢিলে দিতে শুরু করেন। এখন পুলিশ ওসব ব্যাপার দেখেও ছাখে না।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। কমুনিষ্ট দেশগুলোতে এসব কুৎসিত কাণ্ড কতদূর হয় জানি না। ওসব দেশের সব খবর জানতেও পারা যায় না। তবে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কমুনিষ্ট দেশগুলিতে সরকারী কড়াকড়ির জন্য এসব ব্যাপার খুবই কম। আমার এক পুলিশ বন্ধুর মুখে শুনেছি, ওয়ারস-তে তাঁর বাড়ির অদূরেই এক মধ্যবয়স্কা অবিবাহিত মহিলা হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তিনি

সন্তানকে নষ্ট না করে যত্ন করে মানুষ করছেন। এ জন্য সমাজ তাঁকে কোনো দণ্ড দেয়নি, পাড়ার লোক ছি-ছি করে না—এবং চাকরি পেতেও কোনো অসুবিধে হয় না।

পশ্চিম দেশগুলির এই বাড়াবাড়ি ও যৌন স্বাধীনতার বীভৎস রূপ যে তাদের সভ্যতার অনেক ক্ষতি করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শরীরের সব রহস্য নষ্ট করে এরা অতি শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। প্রকাশ্যে নারী শরীর নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি ও যখন তখন সহবাসের ফলে—জীবন সম্পর্কে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা মানুষের শরীর ও মনের যে স্বাধীনতার কথা বলেন, তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নকল শিল্পী ও নকল লেখকরা উৎকট শব্দ লাম্পট্যের দৃশ্যে শিল্প-সাহিত্য ভরিয়ে ফেলছে। ফিল্‌মে, থিয়েটারে নগ্নতা ও মৈথুনের দৃশ্য একটা বিরক্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এমনও শুরু হয়েছে, কোনো কোনো ফিল্‌মে মাঝামাঝি কোথাও নগ্ন দৃশ্য শুরু হলেই দর্শকরা বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যায়। 'আমেরিকা হুর্‌রা' নামে একটি নাটকে নারী-পুরুষের সঙ্গমকে হাস্যকর করে দেখানোর জন্য প্রমাণ-সাইজের পুতুলকে দিয়ে মঞ্চের ওপর সঙ্গম করানো হয়েছে। অবাধ যৌন ক্রিয়া-কলাপের জন্য মানুষের পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে, বাড়ির প্রতি মানুষের আর কোনো আকর্ষণ নেই—'গৃহ শান্তি' জিনিসটা অবলুপ্ত, সেইজন্য মানুষ সব সময় অস্থির, ছন্নছাড়া—মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পরিণতি নেই। যৌন ভোগের চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছে বলেই আজ এর প্রতি একটা বিতৃষ্ণাও দেখা দিচ্ছে, এর স্থান গ্রহণ করছে নানারকম মাদকের নেশা। আমেরিকার কলেজের ছেলেমেয়েরা ঝোপের আড়ালে বসে এখন আর চুম্বন-আলিঙ্গন করে না, তার বদলে গাঁজা খায় কিংবা এল এস ডি খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। এই নেশার ঝোঁক যদি কাটে, তবে হয়তো আবার তারা সুস্থ জীবন ফিরে পাবে, নইলে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসই তাদের নিয়তি।

কিন্তু, আমাদের দেশে বসে বসে ওদের শুধু নিন্দা করারও কোনো যুক্তি নেই। ঐ রকম বিকৃত স্বাধীনতার দিকে না-গিয়েও আমাদের অনেক স্বাধীনতা এখনও পাওয়া দরকার। অনেক সংস্কার ভেবে, ট্যাবু থেকে মুক্ত হয়ে পশ্চিমী সভ্যতার অনেক লাভও হয়েছে। যৌন স্বাধীনতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স বা আমেরিকার তরুণ-তরুণীরা যেমন যৌনতার সব বিধিনিষেধ ভেঙেছে, তেমনি তারা ছাত্র আন্দোলন কিংবা বিপ্লব বাধাতেও জানে, যুদ্ধে তারা হয় শ্রেষ্ঠ সৈনিক, কলকারখানায় কাজ করার সময় তারা কঠোর শ্রমিক। একজন রাশিয়ান শ্রমিকের তুলনায় একজন জার্মান শ্রমিকের শ্রম উৎপাদন বেশী। আমাদের দেশে অধিকাংশ যুবক-যুবতীর মধ্যে অবরুদ্ধ যৌনবাসনা—তাই তারা কোলকুঁজো, মিনমিনে ও অলস।

এবং যথার্থ নারী স্বাধীনতাও তারা আয়ত্ত করেছে। আমাদের দেশে আমরা নারী স্বাধীনতার রূপ এখনও একটুও দেখিনি। একজন দৈবাৎ কোনো পরপুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হলেই তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে না —শুধুমাত্র এই সংস্কারটুকু কাটিয়ে উঠলেই মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কতদূর বিস্তৃত হয়ে যেতে পারে। ইটালিতে পাহাড়ী এলাকায় একটি নির্জন টিলার ওপরে একটি পোস্ট অফিসে এসে একজন মহিলাকে কাজ করতে দেখেছি—দেখে মনে হয়েছে তিনি নিজের জীবন ও মানসম্মানের দায়িত্ব একা নিতে জানেন—একেই বলে স্বাধীনতা। যৌন সংস্কার ও নৈতিক বিধিনিষেধের প্রায় সব কটিই অবৈধ সন্তান জন্মের ভয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিবাহিত, দায়িত্ববদ্ধ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো হিসেবে সন্তানের জন্ম হলেই তা উত্তরাধিকার প্রথা, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমগ্র সমাজকে বিব্রত করে তুলতে পারে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের অবাধ প্রচলন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণাও অনেক পাল্টাতে বাধ্য। পশ্চিমী

সভ্যতার উন্নতির প্রথম ধাপ ছিল এই, দু'জন পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষ—তারা কিভাবে জীবন যাপন করবে, বিবাহ করবে, কি করবে না, কতদূর যৌন-সম্ভোগে রত হবে, তা নির্ধারণ করবে, শুধু তারা দুজনেই। অন্য কেউ সেখানে হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের দেশে সেইটুকুও এখনও আয়ত্ত হয়নি।

৮

আটলান্টিকের উপরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, রাত্রি আবার বিকেল হল। জেট প্লেনের জানালা দিয়ে নিচে কিছু দেখা যায় না, অন্ধকার, আকাশে বহুক্ষণ সূর্যাস্তের দৃশ্য ছিল, তারপর আকাশ ও সমুদ্র উভয়েই অন্ধকারের সমুদ্র হল। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমেরিকা।

আমি জানলার পাশেই বসেছিলাম, আমার পাশে বসা সহযাত্রীর বোধহয় ঈর্ষা হচ্ছিল, বারবার উঁকি মেরে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো ভদ্রতা করে আমি ওঁকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বদলে নিতে পারতাম, কিন্তু কি রকম যেন মন খারাপ লাগছিল খুব, আর মন খারাপের সময় ভদ্রতা দেখানোর কথা মনে আসে না। একটু পরেই আমেরিকায় পৌঁছুবো, কত উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, উদ্দীপনা জাগার বুঝি কথা ছিল। অথচ কি রকম যেন ঠাণ্ডা মন খারাপ। প্রচুর খাদ্য দিয়ে যাওয়া হল সামনে, একটা জিনিস প্রায়ই লক্ষ্য করেছি, প্লেন যখনই সমুদ্রের উপর দিয়ে যায়, তখনই বার বার নানান পানীয় ও সুখাদ্য পরিবেশন করে যায় সুন্দরী এয়ার হোস্টেসরা। লোকের মন ভোলাবার জন্য, সমুদ্র পার হবার সময় অধিকাংশ প্লেন-যাত্রীদেরই নাকি ভয় ভয় করে। পেট ভরলেই মন ভালো হবে কিংবা ঘুম পাবে। আর এতো সব

সমুদ্রের মধ্যে কু-খ্যাত, আটলান্টিক-এর উপর দিয়ে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা উড়ে যাওয়া।

আমি একটিও সুখাদ্যের অপব্যবহার করিনি। তবু মন ভরলো না। কি রকম একা, উদাস, শূন্য। প্লেন উড়ে চলেছে প্রায় ৪৫ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে, এত উঁচুতে উঠলে মন বোধহয় স্বভাবতই শূন্য হয়ে আসে। আর মন শূন্য হলে বাইরের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। আমি সহযাত্রীকে জানলার পাশের আসন ছেড়ে দিইনি।

লোকটি অনেকক্ষণ উসুখুসু করতে লাগলো। কড়া পানীয়ের অর্ডার দিতে লাগলো মাঝে মাঝে। আমি একটি কথা বলিনি। হঠাৎ লোকটি গলা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো শব্দ করলো। আমি শূন্য চোখে তাকালাম। মধ্যবয়স্ক, মোটাসোটা চেহারার লোক, দেখলেই মনে হয় হাসি-খুশী, অর্থাৎ যে-সব লোক জীবনটা উপভোগ করতে হবে, সব সময় আনন্দ পেতে হবে এই ভেবে প্রচুর কষ্ট করে। বুঝতে পারলুম লোকটি আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করতে চায়, অর্থাৎ সেই ধরনের মানুষ যারা বেশীক্ষণ একা চুপ করে বসে থাকতে শেখেনি, আবার কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়তেও ভালো বাসে না।

—কী তুমি চুপচাপ বসে আছো, বইও পড়ছো না—কী, ফিলিং হোম্ সিক্ ?

—আমি শুকনো হেসে বললাম, না, আমি বাড়ি ছেড়েছি মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে। এরই মধ্যে বাড়ির জন্য মন কেমন করবে কেন ?

—তুমি কি জাত ? ইজিপ্শিয়ান ?

না, আমি—

জাপানী ?

—না, আমি—

—আরব ?

—না।

—প্যানীশ ?

—না, আমি—

— তবে কি নিগ্রো, ও আ আম্ সরি আফ্রিকান ?

লোকটির জ্ঞানের বহর দেখে আমার মজাই লাগলো। জাপানী থেকে স্প্যানীশ্ থেকে আফরিকান যে এক নিঃশ্বাসে বলতে পারে—তার প্রতি আমার তৎক্ষণাৎ কৌতূহল হল। অথবা কি লোকটি সুরেশ্বরীর কৃপায়—আমি বিনীতভাবে আমার নিজের দেশের নাম জানালুম ?

—ভারতবর্ষ ? ওব্ বাবা, সে যে অনেক দূর ! তাই না ?

—হ্যাঁ, দূর। কিন্তু জাপানের থেকে কাছে !

—আমি কখনও কোনো ভারতীয় দেখিনি। আচ্ছা, তোমরা তো গরুকে পূজো করো, তাই না ?

লোকটিকে আমার খুব ভালো লাগলো। এমন সরল মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। যে-দেশ সম্পর্কে যেটুকু সামান্য জ্ঞান আছে, তা সঙ্গে সঙ্গে জানাতে আর দ্বিধা করে না। আস্তে আস্তে আলাপ হবার পর জানতে পারলুম, লোকটি আমেরিকার একজন মাঝারি ব্যবসায়ী, এক সপ্তাহ ছুটি কাটাতে প্যারিসে এসেছিলেন। জীবনে কখনও ভারতীয় দেখেন নি, 'কেন আমেরিকায় তো অনেক ভারতীয় আছে ?' —আমার এ-কথার উত্তরে, তিনি জানালেন যে, তা হয়তো আছে, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিনতে পারেন নি, জীবনে একমাত্র সত্যিকারের খাঁটি বিদেশী দেখেছেন একজন ইজিপ্-শিয়ানকে, ওঁর কোম্পানিতে চাকরি করেন। ভারতীয়রা গরুকে পূজো করে, একথা উনি কোথায় গুজব শুনেছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটির সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমে গেল। খুব আন্তরিক ব্যবহার। কোন রকম কৃত্রিম আদব-কায়দায় ধার ধারেন না। ওরই ফাঁকে আমাকে শুনিয়ে দিলেন, ওঁর এক মেয়ে লেখাপড়ায় খুব ভালো, ওঁর ছেলেটা বাউণ্ডুলে—ঐ যে বীটনিক্ না কি-যেন বলে, তাই হয়ে গেছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম,

লোকটির সঙ্গে আমার কথা বলতে খুব ভালো লাগল—আসলে আমিও বোধ হয় চাইছিলাম কথাবার্তা বলতে, বহুক্ষণ কথাবার্তা না বলতে পেরেই আমার মন খারাপ লাগছিল।

এক সময় আকাশ ঘোর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আবার দেখি আলো ফুটছে। সকাল নয়, বিকেলের আলো। প্যারিস থেকে প্লেন ছেড়েছে বিকেল চারটের সময়, নিউ ইয়র্কের আইডল্‌ওয়াইল্ড (এখন কেনেডী) বিমান বন্দরে পৌঁছুবে বিকেল সাড়ে ছটায়। একদিনে দুবার সন্ধ্যা (বাংলা সন্ধ্যা, সংস্কৃত অর্থে নয়) দেখার সৌভাগ্য জীবনে আমার ঐ একবার মাত্র।

প্লেন বিমান বন্দরে আকাশে ঘুরছে, আমার সহযাত্রী আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ঐ ভ্যাখো, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, আর ঐ যে দেখছো চূড়ার মতো খানিকটা আবছা হয়ে গেছে—ঐটা হচ্ছে এম্‌পায়ার স্টেট বিল্ডিং, আর ঐ যে—

আমার ওসব দেখার খুব আগ্রহ ছিল না। ওসব তো পরে কোনো সময়ে দেখবোই। আমি দেখছিলাম হর্ম্যসারির আলোর রেখা, দেখছিলাম এই অতিকায় শহর আমাকে গ্রহণ করবে কিনা। কোনো যুক্তি নেই, তবু বার বার আমার মনে হচ্ছিল, এ শহর হয়তো আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে—আমাকে এয়ার পোর্ট পেরুতেই দেবে না, বলবে, যাও, তুমি পরের গাড়িতেই ফিরে যাও। তোমার তো এত তাড়াতাড়ি আসার কথা ছিল না। হয়তো বলবে, তোমার চুল কেন ওরকম করে ছাটা, অথবা তোমার চোখ কেন ওরকম, কাস্টমসের অটো কর্মচারী বলবে, কেন মাথা ভরা দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছো, যাও ফিরে যাও!

প্লেন নিশ্চল, সিঁড়ি লাগালো। ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে নেমে এলাম—আমার সহযাত্রীর সঙ্গে। তোমার আর আমার কাস্টমসের ঘর আলাদা। আমরা দুজনে দুদিকে যাবো। আমি বললুম, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব খুশী হলাম। বিদায়, ততক্ষণে সিঁড়ি থেকে নেমে আমি আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছি, সহযাত্রী হাত

বাড়িয়ে বললেন, আমেরিকার মাটিতে তোমাকে স্বাগতম জানাবার প্রথম সৌভাগ্য আমাকে দাও! ওয়েলকাম টু আমেরিকা।

হাত ঝাঁকালুম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ। বিদায়।

কাস্টমসের ঘরে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। তার আগে, একজন এসে ভিড়ের মধ্যে আমাকেই শুধু বাছাই করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এক্স-রে প্লেট এনেছো?

—আমি? এক্স-রে প্লেট?

এনেছি না শেষ মুহূর্তে ফেলে এসেছি? বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো। যদি না এনে থাকি, তবে কি ফিরে যেতে হবে এখুনি? যা ভেবেছিলাম তাই সত্যি হবে? হাত ব্যাগে নেই। বাক্সের মধ্যে কি আছে? ইস্ মনেই পড়ছে না—শেষ মুহূর্তে ভরেছিলাম কিনা।

—কোন্‌টা তোমার স্যুটকেশ? চিনতে পারছো?

হ্যাঁ, অটোমেটিক রোলার গড়িয়ে আসছে অনেক বাক্স, খপ্ করে আমারটা তুলে নিলাম। উৎকণ্ঠিত হাতে তালায় সহজে চাবি লাগে না। লাগলো। আছে! লোকটি এক্স-রে প্লেট একটা যন্ত্রে বসিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। কি নিষ্ঠুর লোকটা, এত সময় নিচ্ছে, আমার বিহ্বল মুখের দিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই! যাও, ঠিক আছে। দেখি তোমার বাক্সে আর কি আছে? আচ্ছা, থাক আর দেখাতে হবে না। এই যে ফেরৎ নাও পাশপোর্ট, ঐ সামনের সোজা দরজা দিয়ে বেরুলেই শহরে যাবার বাস পাবে। ওয়েলকাম টু আমেরিকা!

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেলাম সেই দরজার দিকে। বিশাল কাচের দরজা আমি সামনে দাঁড়াতেই ম্যাজিকের মত আপনি খুলে গেল। বাইরে অসম্ভব উজ্জ্বল আলো ও জনতা। আমি তার মধ্যে মিশে গেলাম।

৭

ইনি আসছিলেন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে শ্যামবাজার মুখো। গজেন্দ্রগমনই বলা যায়, কেন না, চেহারাটা ছোটখাটো হাতিরই মতন। ছোট ছোট শিং দুটোয় বালি মাখানো রয়েছে। বালির স্তূপ দেখলেই ষাঁড়দের মনে কি রকম যেন পুলক জাগে, মনের সুখে মাথা দিয়ে ঢুঁসোয় বালির স্তূপ। হয়তো এই বলীবর্দের বালি নিয়ে লীলাখেলায় কিছু বিঘ্ন ঘটেছিল, তাই মেজাজটা অপ্রসন্ন। মাঝে মাঝে গম্ভীর তেজালো গলায় হাঁক উঠছে, উঁ—গাঁক্, উঁ—গাঁক্! রাস্তায় মানুষ জন, ফুটপাতের তরিতরকারিওয়ালা সভয়ে দেখছে ওর দিকে, ওর অবশ্য কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মৃদুমন্দ গতিতে একখানা পা টেনে টেনে চলেছেন শ্যামবাজারের দিকে, মনে হয় ওনার কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে সেখানে।

বাসস্টপের কাছে বেশ ভিড়, অনেকক্ষণ বাস আসেনি। উনি সে-সব গ্রাহ্য করলেন না, ভিড় ঠুসেই আসতে লাগলেন, মুহূর্তে ভিড় ছত্রাখান হয়ে গেল। এক যুবতী পৃথিবী বিস্মৃত হয়ে শুধু সম্মুখস্থ এক যুবার চোখে চোখ রেখে কথা বলছিলেন, হঠাৎ কনুইয়ের পাশে শিং সমেত ঐ বিরাট মুণ্ড দেখে এমন একখানা লাফ দিলেন, কোনো মহিলাকে সে-রকম লাফ দিতে আমি আর একবারই দেখেছি (ছবিতে), তিনি হাই জাম্পে অলিম্পিক চামপিয়ন ইয়োল্যানডা বালাস্। ষাঁড় মহাপ্রভু আবার এগিয়ে চললেন সামনে।

কলকাতার ষাঁড়দের গতি দ্রুত হতে পারে না, কেন না, তাদের একটা পা বাল্যকালেই ইনজেকশন দিয়ে জখম করে দেওয়া হয়। জখম করার পরও কলকাতার রাস্তায় কেন ছেড়ে দেওয়ার রীতি আছে বহুকাল ধরে, তা অবশ্য জানি না। কলকাতা ও শহরতলীর শকুনরা পৌরসভার অনেক উপকার করে জানি, পৌরসভা প্রতীকই

তো হাড়গিলে শকুন। তবে, ষাঁড়দের উপকারিতা বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। অবশ্য লোখমুখে একটা কারণ শুনতে পাই সেটা আবার লেখা চলে না।

এক সময় রাস্তা থেকে বেওয়ারিশ ষাঁড় গরু হটাবার একটা উদ্যোগ হয়েছিল, বছর নয়েক আগে বোধহয়। হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেল কেন কে জানে! এর সঙ্গে গো-রক্ষা আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাই বা কে বলবে! কিন্তু, এখনও প্রায়ই খাটাল অপসারণের আস্ফালন শুনতে পাই, ষাঁড় খেদাও আন্দোলন একদম স্তব্ধ। যাই হোক, সেটা আমাদের বিষয় নয়।

ইনি যাচ্ছিলেন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে, উনি আসছিলেন গ্যালিফ স্ট্রিট দিয়ে। এনার রং সাদা, ওনার রং লালচে। মুখোমুখি দেখা হলো শ্যামবাজারের মোড়ে। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। দুজনে মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

প্রথমে মনে হয়েছিল বন্ধু। নাকে নাক ঘষাঘষি করলেন, দুজনেই দু'বার হাঁক দিলেন উঁ-গঁক্, উঁ-গোঁক্। তারপর ল্যাজ দুটো ঝাপটাতে লাগলো মৃদু মৃদু, দু'জনেরই পিছনের পা মাটি আঁচড়ালো। এরপর দু'জনেই পিছিয়ে এলেন খানিকটা, আর একবার হুঙ্কার, তারপরই শৃঙ্গে শৃঙ্গাঘাত! দুই শিবের বাহন প্রমত্ত হলেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে।

লালচে ষাঁড়টির আয়তন ছোট, কিন্তু মনে হয় যেন তারই তেজ বেশী। প্রথমটায় সেই সাদা ষাঁড়টাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো সারকুলার রোড পর্যন্ত, অনেকখানি পিছিয়ে সাদাটা আবার প্রবল উদ্যমে ঠেলে লালচেকে নিয়ে এলো নেতাজীর মূর্তির কাছে। তারপর চললো এরকম হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি আর গর্জন।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় ফাঁকা। সমস্ত লোক ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গাড়ি বারান্দার নিচে, নিরাপদ দূরত্বে। রিক্সাওয়ালারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে, একটা রিক্সার গায়ে ওদের সামান্য ধাক্কা লেগেছিল, তাতেই তার চাকা ভেঙে দু'টুকরো। দু'জন

অকুতোভয় পুলিশ কনস্টেবল এগিয়ে গিয়েছিল ওদের থামাতে, বেশী দূর যেতে হলো না, ঠেলাঠেলি করে ষাঁড় দুটো ওদের দিকে দ্রুত আসতেই ওদের পরিত্রাহি দৌড় দেখার মতন।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে চললো লড়াই, শ্যামবাজারের পাঁচটা রাস্তার সব যানবাহন থেমে রইলো, মানুষ চলাচলও বন্ধ। দুটো ষাঁড়েরই একটা করে পা খোঁড়া। তবু কি বিপুল তেজ, মাংসাপেশী কি প্রবল শক্তি। এ-পাশ থেকে ও-পাশ থেকে ছোটাছুটিতে একটুও ক্লান্তি নেই, সাদা ষাঁড়টা শুধু একবার গোবর ত্যাগ করে ফেললো --তবু অবদমিত। মোট কথা আধ ঘণ্টা ধরে গোটা শ্যামবাজারের পাঁচমাথা রইলো ওদের অধিকারে।

সপ্তদশ অশ্বারোহী একবার গোটা বাংলা দেশ জয় করে নিয়েছিল না? সেদিন আমার মনে হল, গোটা সতেরো ষাঁড় যদি এককাটা হয়, তাহলে অনায়াসেই কলকাতা শহরটাও জয় করে নিতে পারে।

হাইড পার্কে একজন লোক বাইবেলের নানান্ ভুল দেখিয়ে খুব তোড়ের সঙ্গে বক্তৃতা করছিলেন। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলুম, লোকটি ভারতীয়, খুব সম্ভবত বাঙালী হিন্দু। আমারই মত গায়ের রঙ খয়েরি কোঁকড়ানো চুল, দৈর্ঘ্যও খুব বেশী নয়। আমার বক্তৃতা করার স্বভাব নেই বলে, ভাবলুম লোকটির বক্তৃতা শেষ হলে আলাদা ডেকে বলবো, হিন্দু ধর্ম তো অন্য ধর্মকে আক্রমণ করতে শেখায় না :

একটু পরে লোকটিকে আলাদা পেয়ে ভরসা করে বাংলাতেই কথা শুরু করি। লোকটি সাদা মুখে তাকিয়ে রইলেন। এবার আমি লজ্জিত হয়ে ইংরেজিতে। লোকটি আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে একটু রুক্ষভাবে উত্তর দিলেন, প্রথমত আমি হিন্দু নই। দ্বিতীয়ত আমি ভারতীয়ও নই। আমি খৃষ্টান এবং ইংরেজ।

—কিন্তু, আপনার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল···

—চেহারা দেখে জাত বোঝায় না। আমি ইংলণ্ডের নাগরিক।

—কিন্তু কিছুদিন আগে নিশ্চয়ই···

—আমি কোনোদিন ইণ্ডিয়ায় যাইনি। আমার ঠাকুরদাদা এসেছিলেন আপনাদের দেশ থেকে। আমার বাবা ছিলেন সাউথ আফ্রিকার নাগরিক। আমি ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব নিয়েছি। কোনো আমেরিকানকে কী আপনি এখন বলতে পারবেন, সে জার্মান কিংবা ফ্রেঞ্চ? সে এখন আমেরিকান। আমিও ইংরেজ।

—ও, আচ্ছা, আমি লজ্জিত। ক্ষমা করবেন। আপনার নাম?

—আর্থার কে চন্দা।

লোকটির সঙ্গে আর একটুক্ষণ সৌজন্যমূলক কথা বলে আমি বিদায় নিলাম। বিলেতে সেই আমার দ্বিতীয় দিন। আগেই

জানা ছিল কিন্তু স্পষ্ট এমনভাবে বুঝতে পারিনি যে, নিগ্রো মাত্রই আফ্রিকান নয়। নাগরিক অধিকারে অনেক নিগ্রোই আমেরিকান বা ইংরেজ। আবার আফ্রিকান মাত্রই নিগ্রো নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা বা দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আছে খাঁটি শ্বেত নাগরিক। তেমনি ভারতীয়ের মতো চেহারা বা নাম হলেই তাকে অন্য ভারতীয়ের পক্ষে আত্মীয় ভাবা চলে না। দাদা বলে ডাকতে গেলে হয়তো গলা টিপে দেবে। ক্রিকেট খেলোয়াড় কানহাইকে নিয়ে ভারতবর্ষের গর্ব করার কিছুই নেই, বরং ভয় করার আছে। এই তো সেদিন আরেকজন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লেখক, নইপাল, যাঁর বংশ কয়েক পুরুষ আগে ছিল ভারতীয়, এখন তিনিই ভারতবর্ষকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে একটা বই লিখেছেন। বম্বের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ফ্র্যাঙ্ক মোরেজ একজন গোয়ানিজ ও এখনও ভারতীয়, কিন্তু তাঁর ছেলে কবি ডম মোরেজ এখন ইংলণ্ডের নাগরিক ও খাঁটি ইংরেজ। এবং তিনিও ভারতবর্ষকে গালাগালি দিয়ে ঋণ শোধ করতে ভোলেন নি। ডম মোরেজের কবিতা 'নিউ পোয়েটস্ অব ইংলণ্ড এণ্ড আমেরিকা' এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

সুতরাং ইংরেজ শুনলেই যে গোরা সাহেবদের কথা এতদিন আমাদের মনে আসতো, এখন আর তা ভাবলে চলবে না। এখন ব্রিটেনে কালো লোকের সংখ্যা নয় লক্ষ, মোট জনসংখ্যার শতকরা দুই ভাগ। এ সংখ্যা খুব নগণ্য নয় ইংরেজদের পক্ষে। কারণ বহু শতাব্দী তার অমিশ্র স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছেন। 'ইংরেজ' এই শব্দটিই ইংলণ্ডের লোক পরম গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে, সারা পৃথিবীর মধ্যে এই জন্যই তাঁরা বিশিষ্ট।

বিজিত দেশগুলি এক এক করে স্বাধীন হবার পর, যখন কমনওয়েলথ সৃষ্টি হয়, তখন গোড়ার দিকে ব্রিটেন বেশ উদারতা দেখাতে চেয়েছিল কমনওয়েলথ দেশের নাগরিকদের প্রতি। ভাবখানা যেন এই, এতকাল ধরে ও-সব দেশ থেকে যত সোনাদানা, অর্থ সম্পদ আনা হয়েছে আহরণ করে, এখন তার বিনিময়ে ও-সব

দেশের কিছু লোক শিক্ষা-দীক্ষা বা চাকরির সুযোগ পাক ইংলণ্ডে। কিন্তু ১৯৫০-এর পর থেকেই বহিরাগতদের সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত লয়ে। কারণ বিদেশী ছাত্র বা চাকুরে এসে নিজেরা একটু গুছিয়ে নিয়েই দেশ থেকে আনিয়ে নেয় নিজের স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন। তাছাড়া গরম দেশের লোকদের জন্মহার বেশী। সুতরাং বহিরাগতদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইংলণ্ডের বুকে বসে যে সমস্ত অ-ব্রিটিশ প্রজার দেখা পাওয়া যেতো, তারা সাধারণত রাজা-মহারাজা-নবাব-শেখ, অথবা নিম্নশ্রেণীর জাহাজী নাবিক-লস্কর। শেলীর কবিতায় ভারতীয় মাঝির মুখের গান ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এখন ইংলণ্ডের বসতি বহুল অঞ্চলে দেখা যাবে; শিখদের গুরুদ্বার, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের মদের দোকান, উর্দু সিনেমা হল। পুরুষরা প্যাণ্ট-কোট পরলেও ও-সব দেশের মেয়েরা নিজেদের দেশীয় পোশাক পরে অসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়। গোঁড়া ইংরেজদের চোখে এ-সব দৃশ্য খুব সুসহ নয়। বহিরাগতদের মধ্যে অর্ধেকই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাকি অর্ধেকের মধ্যে ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং আফ্রিকানরা প্রায় সমান সমান।

১৯৬২ সালে পাশ হয়েছিল বহিরাগমন নিরোধ আইন। কিন্তু উপস্থিত বহিরাগতদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিকারে সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে একটি আইন পাশ করা হয়েছে—যার ফলে হোটেল-রেস্টুরেণ্ট, সিনেমা, থিয়েটার, যানবাহনে বহিরাগতদের প্রতি অসমান ব্যবহার আইনের চোখে দণ্ডনীয়। এতে কিন্তু চাকরি বাড়িভাড়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই বিলের স্বপক্ষে আর বিপক্ষে ভোট পড়েছিল যথাক্রমে ২৬১ আর ২৪৯, সামান্য ব্যবধান থেকেই বোঝা যাবে যে, ইংলণ্ডের জনমত পুরোপুরি এখনও এর স্বপক্ষে নয়। অধিকাংশ ইংরেজই এখনও এই সব কালো (আদর করে যাকে ওরা বলে 'রঙীন') বহিরাগতদের সংস্পর্শ এড়িয়ে থাকছে। যাতে ওরা খাঁটি ইংরেজ পাড়ার মধ্যে বাড়ি ভাড়া না পায়, ইংরেজ

সন্তানদের জন্য সুরক্ষিত ভালো ভালো চাকরি না পায়, সে চেষ্টার বিরাম নেই। এখনও বহিরাগতদের জন্য নিম্ন শ্রেণীর চাকরিই বরাদ্দ। ওদের আচার-আচরণ সংস্কৃতির ছাপ ইংরেজদের উপর যাতে না পড়ে, সে সম্বন্ধেও শুচিবায়ুর অন্ত নেই। কিন্তু অনেকের ধারণা এই শতাব্দীর শেষে কালো বহিরাগতদের সংখ্যা ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষে দাঁড়াবে! এই বিপুল সংখ্যাকে বেশীদিন কী দূরে সরিয়ে রাখা যাবে? সংস্কৃতির মিশ্রণ, মিশ্র বিবাহ শুরু হবেই। তাই স্পেকটেটর কাগজে একজন পার্লামেন্টের সদস্য সখেদে লিখছেন, আর কিছুদিন পর আমাদের সমস্ত ইংরেজদেরই গায়ের রঙ হয়ে যাবে চকোলেটর মতো, আমাদের সমাজ হবে মিশ্র আফ্রো-এশীয় সমাজ!

॥ ১১ ॥

রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য গিয়েছিলাম হাসপাতালে। আমার কী অসুখ হয়েছে জানি না। আমার মনের মধ্যে একটা কঠিন অসুখের ভয় ঢুকে আছে।

নার্সের সামনে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। নার্সটি তরুণী, এমন চকচকে চেহারা যে দেখলে হঠাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মনে হয়। অথচ ঝরঝরে কষে বাংলায় কথা বলছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে।

অনেক নার্সকেই দেখেছি গোমড়ামুখী। এই নার্সটি বেশ হাসিখুশী। কত অবলীলাক্রমে আমার হাতটি তুলে নিলেন নিজের হাতে। নার্সটি সমবয়েসী। এই বয়েসী কোনো অচেনা মেয়ের হাত আমি এমন ভাবে ধরতে পারি? অভ্যাসে কত কী হয়!

নার্স সিরিঞ্জ ফুটিয়ে আমার হাত থেকে রক্ত তুলে নিতে লাগলেন। নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, কাচের নলে উঠে আসছে আমার রক্ত। ব্যথা নয়, আমার খুব অস্বস্তি বোধ হলো।

সিরিঞ্জ ফোটাবার আগে, স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে নার্স যখন আমার হাতটা ঘষে দিচ্ছিলেন, তখনও আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। কেন না, স্পিরিট ভেজানো তুলোটা ঘষামাত্রই সেটা এমন ময়লা হয়ে গেল যে, মনে হয়েছিল নার্স বুঝি আমাকে বকবেন। ধমকে বলবেন, চান টান করেন না নাকি?

আমার হাতখানা দেখতে তো বেশ পরিষ্কারই, রোজ সাবান মাখিনা অবশ্য, কিন্তু স্নান তো রোজই প্রায় করি (শীতকালে দু'একদিন বাদ যায়) তবু এত ময়লা আসে কি করে? কিংবা স্পিরিট দিয়ে ঘষলে সবারই গা থেকে ময়লা ওঠে? চকচকে আয়নাতেও তুলো ধরলে ময়লা দেখা যায়। আমি শুধু শুধু নার্সের ধমকের ভয় পাচ্ছিলাম।

রক্ত টানার সময়টা কী দীর্ঘ। শেষ হলে বাঁচি। মনে হচ্ছে যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলছে। ঠিক যে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি তাও নয়—এখন আবার অন্য রকম অস্বস্তি।

আমার হাতখানা ঝুলছে, তাতে সিরিঞ্জ বেঁধানো, কিন্তু আঙ্গুলগুলো নার্সের বুকের প্রায় কাছে। সিকি ইঞ্চি তফাৎ বড়জোর। যে কোনো সময় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে পারে। আমার কোনো শুচিবাই নেই অবশ্য, কিন্তু এই কি বুক ছোঁয়ার সময়! তা ছাড়া, এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই, কেন না আমার হাত নার্সের হাতে বন্দী।

নার্সের মুখ নির্বিকার। উনি শুধু রক্ত দেখছেন, নিজের বুক দেখছেন না। কিন্তু আমার পক্ষে নির্বিকার থাকা চলে না। আমার হাতের আঙ্গুল কোনো মেয়ের ভরাট বুকের কাছে—অথচ আমি নির্বিকার থাকবো—আমি তো ডাক্তার নই! আঃ, রক্ত নিতে কত সময় লাগে।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সেই সময় রক্ত নেওয়া শেষ হলো এবং নার্সের বুকের সঙ্গে আমার আঙ্গুল ছুঁয়ে গেল।

একটু লজ্জিত ভাবে হেসে তাকালাম নার্সটির দিকে। যদিও আমার লজ্জা পাবার কোনো কারণই নেই, আমি তো আর ইচ্ছে করে ছোঁওয়া লাগাইনি।

নার্সের মুখে কোনো লজ্জা টজ্জা নেই, সিরিঞ্জের রক্তের দিকে উনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেন উনি রক্ত খুব ভালোবাসেন। বুক ছোঁয়াটোঁয়ার মতন সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামান না।

নার্স বললেন, আপনি ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে পারবেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন আরও কিছু বাকি আছে?

—একটা টেস্টের ফলাফল ঘণ্টাখানের মধ্যেই জানা যাবে। আপনি জেনে যেতে পারতেন।

আমি বললুম, আচ্ছা, অপেক্ষা করছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

নার্স মুচকি হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা!

মুচকি হাসি কেন? ধন্যবাদ শুনলে কেউ হাসে? কিংবা কিসের জন্য ধন্যবাদ নার্সের প্রাপ্য। আমার মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব এসেছিল, ধন্যবাদ না বলে আমার উপায় ছিল না।

বাইরে বেরিয়েই মনে হলো, নার্সটির নাম জিজ্ঞেস করলে কেমন হতো?

হাসপাতালে এইটুকু কাজের জন্য এসে কেউ নার্সের নাম জিজ্ঞেস করে না। যদিও নার্স আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন··· কারণ সেই নাম আমার রক্তভরা টিউবের ওপরের লেবেলে লিখতে হবে। হাসপাতালটা একটা অদ্ভূত জায়গা, এখানে একপক্ষ শুধু নাম জিজ্ঞেস করে। সভ্য সমাজের নিয়ম কিন্তু অন্যরকম।

বাইরে বেরিয়ে এসে শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছিল। শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে যাবার জন্য নয়—একরকম হাল্কা ভালো লাগা আমি আগেও অনেকবার বোধ করেছি। তাহলে শুধু রক্ত বিয়োগ নয়, আঙ্গুলের তলাতেও খানিকটা ভালোলাগা আছে! নার্সকে নিশ্চিত ধন্যবাদ।

এখন মুস্কিল হলো, এই এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা। কাছাকাছি কোনো বন্ধুর বাড়িও নেই। দারুণ রোদ্দুর, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার কোনো মানে হয় না। অগত্যা হাসপাতালের মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কম্পাউণ্ড বেশ বড়।

আমি পারতপক্ষে হাসপাতালে আসি না। নিকট আত্মীয়দের অসুখ বিসুখেও আসা হয় না। অথচ এখন একজনও চেনা কেউ রুগী হয়ে নেই, তাহলে এই ফাঁকে বেশ একটা কর্তব্য করে নেওয়া যেত।

হঠাৎ খুব ইচ্ছে হলো, অচেনা কোনো রুগীর পাশে বসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিই। তাকে খুব আন্তরিক ভাবে সান্ত্বনা জানাই। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যেমন অচেনা অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যেও পিণ্ড অর্পণ করতে হয়, তেমনি, নিজের চিকিৎসার সময় অন্য অচেনা

কারুর রোগ মুক্তির জন্যও প্রার্থনা করা উচিত বোধহয়। সেই মুহূর্তে, আমার অদেখা অচেনা কোনো মুমূর্ষ রোগীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললুম, তুমি ভালো হয়ে ওঠো তুমিও আমার সঙ্গে বেঁচে থেকে এই পৃথিবীকে দেখো।

ক্যান্টিনে বেশ ভিড়। ডাক্তারি ছাত্ররা সেখানে খুব রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে। বেশীক্ষণ বসা যায় না, পনেরো মিনিটের বেশী সময় কাটানো গেল না।

এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলুম। লাল রঙের বাড়িগুলির মাঝে মাঝে ফুলবাগানও আছে। কিন্তু সর্বত্র ডেটলের গন্ধ। ফুল গন্ধে ও ডেটলের গন্ধ। রাস্তাগুলো খোলা ব্যাণ্ডেজের মতন। খারাপ লাগছিল না। অনেক রকম মানুষ দেখা যায়। হাসপাতালে শুধু তো আর অসুস্থরাই আসে না।

এই সময় একটা অদ্ভুত লেখা চোখে পড়লো। প্রধান বাড়িটার পাশে একটা সরু মতন গলি, সেখানে দেওয়ালের গায়ে লেখা, 'মোরনার্স কর্ণার'—শোকার্ত—আত্মীয়দের বিশ্রাম গৃহ।

হাসপাতালে এরকম কোনো জায়গার অস্তিত্ব তো জানতুম না। শুনিও নি কখনো। অবশ্য, হাসপাতালে এসে শোকপ্রকাশ করার সুযোগও কখনো আমার আসে নি।

যাই হোক, ব্যাপারটা আমার বেশ ভালো লাগলো। বাংলা অনুবাদ বিচ্ছিরি হলেও ইংরেজি শব্দ দুটোর মধ্যে ঝঙ্কার আছে। এই হাসপাতালটা এক সময় সাহেবদের ছিল।

আমি কারুর জন্য শোক করতে চাইনি, নিজের জন্যও নয়, এবং আমি অপরের সুখ প্রার্থনা করছিলুম। তবে ইচ্ছে হলো একবার ঐ জায়গাটা দেখে আসি। অবশ্য কেউ বোধহয় ওখানে নেই, সকালবেলা শোকের সময় নয়। এখানে কেউ না থাকলেই ভালো, লোকের ঘরে বসে মনের সুখে একা একা সিগারেট টানা যাবে। মনে হয়, সারা হাসপাতালে এই একমাত্র নিরিবিলি জায়গা।

ঢুকে দেখলুম, ফাঁকা ঘরটিতে একমাত্র মানুষ বসে আছে। বিশাল দীর্ঘ চেহারার প্রৌঢ়, হাতের ওপর কপাল রেখে মুখ নীচু করা, হঠাৎ মনে হয় ঘুমন্ত। কিন্তু শরীরটা মাঝে মাঝে দুলে উঠছে। ভদ্রলোক একা একা কাঁদছেন নাকি? এত বড় চেহারার একজন পুরুষ মানুষের কান্না দেখলে কি রকম অস্বাভাবিক লাগে—তাও একা একা। নিঃশব্দ কান্না আবার বেশী করুণ। ভদ্রলোকের কি বাড়ি-ঘর নেই? সেখানে বসে কাঁদলেই তো পারতেন।

আমি একটু দূরে বসে সিগারেট ধরালুম। বোধহয় আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। ভদ্রলোক হয়তো আমাকে দেখলে লজ্জা পাবেন। কিন্তু আমারও যে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

একটু বাদে ভদ্রলোক মুখ তুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টে। কোনো কথা বলছেন না। সুতরাং আমিই বললাম, আপনার কেউ মারা গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, না, কেউ মারা যায়নি। ঠিক আছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি সমস্ত মুখমণ্ডল মুছলেন। মোছার পরেও চোখে জল এলো। আবার মুছলেন।

আমি সরল ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কারুর গুরুতর অসুখ?

—না কারুর অসুখ নয়। ঠিক আছে।

—অসুখ নয়। মানে, আপনি—

—বললাম তো, ঠিক আছে। কিছু হয়নি। কিছু হয়নি!

আমি থতমত খেয়ে বললুম, আপনাকে বিরক্ত করলুন, মাপ করবেন! আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

লোকটি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। গলা পরিস্কার করে বললেন, না না ঠিক আছে। তুমি এখানে এসেছো কেন ভাই। তোমার কেউ মারা গেছে।

—মানে, আমার এখন কিছুই করার নেই। তাই এখানটায় নারাবাল।

—কিছু করার ইনে তো হাসপাতালে কেন ?

—এমনিই, মানে একটু দরকারে।

—এমনি এমনি কেউ হাসপাতালে আসে না। আমি আজ এই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম।

—আপনার কি হয়েছিল।

—খুব কঠিন অসুখ। বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। তবু হঠাৎ বেঁচে গেলাম!

—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

—তাই তো মনে হয়। অথচ আমি হাসপাতালে এসেছিলাম মরতেই।

—সে কি! আমি তো হাসপাতালে এসেছি ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য। সবাই তো সেইজন্যই আসে!

—তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

—মা, বাবা, ভাই, বোন—

—বন্ধু-টন্ধুও আছে নিশ্চয়ই।

—তাও আছে।

—আমার কেউ নেই।

—সেইজন্যই আপনি মরতে চান? তাহলে তো আত্মহত্যা করলেই পারতেন। শুধু শুধু এতগুলো ডাক্তার আর নার্সদের পরিশ্রম করালেন কেন?

—আত্মহত্যা করার মতন মনের জোর আমার নেই। অসুখ হবার পর হাসপাতালে-ভর্তি হয়েছিলাম। কোনো ডাক্তার আশা দেয়নি। ভেবেছিলাম এমনি এমনিই মরে যাবো। হঠাৎ বেঁচে গেলাম। ছাড়া পেয়ে গেলাম আজকে। হাসপাতাল থেকে বেরুচ্ছি, তখন এই ঘরটা চোখে পড়লো। এই ঘরটা চুম্বকের মতন আমাকে টানলো। আমি বুঝতে পারলাম, আমি মরে গেলে আমার জন্য কাঁদবার কেউ নেই। আমি মরে গেলে একজন মানুষও চোখের জল ফেলবে না।

—সেইজন্যই আপনি নিজের জন্য—

ভদ্রলোকের চোখে আবার জল এসে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এক ঘণ্টা কি হয়ে গেছে? লোকটির হাতেও ঘড়ি নেই —উনি সময়ের খবর রাখেন না। ওঁর দুঃখ আমি বুঝতে পারবো না।

ফিরে এসে সেই নার্সটিকে আর দেখতে পেলাম না। কারুকে যে ওঁর কথা জিজ্ঞেস করবো—তারও উপায় নেই, কারণ ওঁর নাম জানি না। একে ওকে জিজ্ঞেস করেও কোনো হদিশ পেলাম না। অথচ আমার রক্তের রিপোর্ট পাওয়া দরকার।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি সেই নাম না-জানা নার্সকে খুঁজে বেড়ালুম। কারুকে কিছু জিজ্ঞেস করি না, চোখ দিয়ে খুঁজি। খানিকটা বাদে দেখতে পেলাম, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামছেন।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আমারটা কি হলো?

নার্সটি ভুরু কুঁচকে বললো, আপনার আবার কি?

আশ্চর্য ব্যাপার, নার্সটি আমাকে এরই মধ্যে ভুলে গেছে। অত কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, উনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন—এক ঘণ্টার মধ্যে সব ভুল!

—আমার রক্ত?

—আপনার নাম?

আমি নাম বললাম। নার্সটির মুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাসি মুখে বললেন, আপনার রক্তে কিছু পাওয়া যায় নি! রিপোর্ট খুব ভালো।

এই মেয়েটি শুধু রক্তের ব্যাপারে আগ্রহী, মানুষ সম্পর্কে কোনো উৎসাহ নেই।

॥ ১২ ॥

আমার বন্ধু তপনের ছিল বদলীর চাকরি। ছ' মাস এক বছর পরপরই তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হতো। ব্যাপারটা তার পক্ষে যতই বিরক্তিকর হোক, আমার কাছে ছিল খুব আনন্দের। সে নতুন জায়গায় বদলী হলেই আমি তার কাছে বেড়াতে যেতাম। আমি তো তখন চাকরি করিই না, অদূর ভবিষ্যতে কখনো চাকরি করবো—সে রকম সম্ভাবনাও নেই। অথচ তপন আমার বয়েসী হয়েও মাসের গোড়ায় এক তাড়া টাকা পায়, বেয়ারা-দরোয়ানরা তাকে 'সাব' বলে ডাকে ও সেলাম করে—এটা ছিল আমার কাছে একটা ঈর্ষার ব্যাপার। মা-বাবার থেকে দূরে একা একটা কোয়ার্টারে থাকা, বাবুর্চির রান্না ইচ্ছে মতন যা-খুশি খাওয়ার সুযোগ—এগুলোও আমার কাছে রোমাঞ্চকর।

একবার তপন বদলী হলো ডালটনগঞ্জে। ও সেখানে কোয়ার্টারে গুছিয়ে বসার এক মাসের মধ্যেই আমি হাজির হলাম। নাম শুনে আমার ধারণা হয়েছিল, ডালটনগঞ্জ বুঝি একটা খুব জমজমাট সাহেবী কায়দার শহর। গিয়ে দেখি একটা ধুলোয় ভরা ছোট্ট জায়গা, শহর না বললেও চলে। তবুও যখন সারাদিনের পর ভারী হয়ে সন্ধে নামে, সিল্কের কাপড়ের মতন হাওয়া এসে গায়ে লাগে, মাথার ওপর ফটফটে নীল আকাশ—অসংখ্য তারায় ভরে যায়—তখন এক ধরনের মাদকতা আসে শরীরে। তপন সারাদিন অফিস করে, আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ি, তারপর সন্ধের দিকে চা-টা খেয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোই এক সঙ্গে। ধুলোর রাস্তা পেরিয়ে আদালত জেলখানা পেছনে ফেলে, নাম-ভুলে গেছি-কি-যেন নদীর পাড় দিয়ে অনেক দূর চলে যাই—তপন অনুযোগ করে, ধুৎ এই চাকরি আর পোষায় না, কখন কোথায় পাঠাবে ঠিক নেই। আমি

মনে মনে বলি, ইস্, আমাকে যদি কলকাতায় আর ফিরতে না হতো, আমার খুব ভালো লাগতো।

সেবার তপনকে একটু গম্ভীর দেখলাম। অন্যবার আমাকে পেয়ে ও দারুণ খুশী হয়ে ওঠে, চতুর্দিকে চাকর-বেয়ারা পাঠিয়ে নানা রকম মাছ মাংস আনায়, সারা রাত ধরে গল্প করে। কিন্তু সেবার যেন সব কিছুই একটু চাপা। দু'এক দিনের মধ্যেই আবিস্কার করে ফেললাম, তপন প্রেমে পড়েছে। শুধু চাকরি নয়, প্রেমের ব্যাপারেও তপন আমার থেকে এগিয়ে গেল। এতে প্রথমটায় আমি একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাব কাটিয়ে উঠলুম। সেই বয়েসে একটা সবজান্তা ভাব থাকে। যে-কখনো একটি অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বলেনি সেও অপরের প্রেমের পরামর্শ দিতে ছাড়ে না। আমার যদিও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু আমি তপনকে বললাম, তোর প্রব্লেমটা কি, বল না।

বহুকাল থেকেই প্রবাসী বাঙালী একটি পরিবার, মেয়েটির নাম শান্তা। রাঁচী কলেজে পড়াশুনো করে, ছুটিতে এসেছে। তপনের এক পিসতুতো ভাইয়ের শ্যালিকার সঙ্গে শান্তার দাদার বিয়ে হয়েছে, সেই সূত্র ধরে তপন গিয়েছিল ওদের বাড়িতে, ক্রমে প্রগাঢ় আলাপ, তপন ও বাড়িতে প্রায়ই নেমন্তন্ন পায়। দূর থেকে দেখলুম একদিন শান্তাকে, ভারী নরম আর স্নিগ্ধ চেহারা মেয়েটির, ওকে দেখলেই কমনীয়তা শব্দটি মনে পড়ে।

তপনের সমস্যা হচ্ছে এই, কিছুতেই ও শান্তার সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। ওদের বাড়ি ভর্তি লোকজন, তপনের সঙ্গে তারা খুব আন্তরিক ব্যবহার করেন, তপন গেলেই সবাই মিলে গল্প করতে বসেন। সকলের অত স্নেহ-ভালবাসা, তবু মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত মানুষের মতন তপন শান্তার একটি কথা শোনার জন্য চেয়ে থাকে।

তপন আমাকে নিয়ে গেল শান্তাদের বাড়িতে। ওরা সবাই

বহুকাল ধরে বিহারে রয়েছেন, আর আমি কলকাতার ছেলে আমার কথাই আলাদা। আমি কলকাতার সব নতুন সিনেমা থিয়েটারের কথা জানি উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনের সঙ্গে আমার প্রায়ই পথে-ঘাটে দেখা হয়। বাসে পকেটমার ধরা পড়লে লোকে কি রকম মারে, কলকাতার কলেজে অধ্যাপকরা কি রকম নাকানি চোবানি খান এ সবই আমার জানা, রহস্যময় কলকাতার সবই আমার নখ দর্পণে। সুতরাং সে বাড়িতে আমিই শুধু বক্তা বাকি সবাই শ্রোতা। দু,তিন-দিন বাদেই আমি শান্তাতে নিয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলুম। ওর অভিভাবকরা অসঙ্কোচে সম্মতি দিলেন।

সেই একটা বয়েস, যখন প্রত্যেকটা মেয়েই চুম্বকের মতন টানে। কারণ বুঝি না, সার্থকতা বুঝি না, তবু কোনো চলন্ত ট্রেনে কিংবা কোনো অলিন্দে কোনো একটি মেয়েকে এক পলকের দেখার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করে। আবার সেই বয়সেই বন্ধুত্বের মূল্য থাকে চরম। শান্তা এমন সুন্দর মেয়ে, কিন্তু তার প্রতি আমার সামান্যতম দুর্বলতাও জন্মালো না। তখন তপনের জন্য আমি যে কোনো সময় প্রাণ দিতেও রাজী ছিলুম। শান্তা সেজেগুজে বেড়াতে বেরুবে, সেই সময় তার ছোট ভাই মণ্টু বললো আমিও যাবো। শান্তার ছোট বোন কেয়া বললো আমিও। না বলা যায় না, ওদেরও সঙ্গে নিতে হলো।

তাতেই সব মাটি হবার উপক্রম, মণ্টুর বয়েস নয়, কেয়ার বয়েস এগার, ওদের দুজনেরই বুক ভর্তি অসংখ্য প্রশ্ন। তপন শান্তার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ পাবে কি, আমাদের তিন-জনকে ঘিরে ধরে মণ্টুর আর কেয়া কলকল্ করে অজস্র কথা বলে যেতে লাগলো। এক মুহূর্তেরও বিরক্তি নেই। তপন করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলো ঘন ঘন। শান্তা খুব লাজুক, সে প্রায় কোনো কথাই বলছে না। তপনের মনের অবস্থা তো বোঝাই যায়, আমারও এমন রাগ হতে লাগলো. ঐ

ছেলেমেয়ে দুটোর ওপর, যে ইচ্ছে হলো ঠাশ ঠাশ করে চড়িয়ে দিই। বিচ্ছু কোথাকার এই সব বাচ্চাদের কাছে বেশীক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যেতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম সেই নাম ভুলে যাওয়া নদীর ধারে। কয়েকটা বড় বড় পাথর পড়েছিল, সেখানে বসলাম, মণ্টু আর কেয়া আমাদের অনবরত জ্বালাতন করতে লাগলো—কলকাতা শহরটা এখান থেকে ঠিক কোন দিকে—সেই প্রশ্ন নিয়ে। তপন আর একবার আমার দিকে মিনতি-পুর্ণ চোখে তাকাতেই আমি উঠে পড়লুম, কণ্ঠস্বরে অতিকষ্টে জোর-করা মিষ্টত্ব ফুটিয়ে বললুম, মণ্টু, কেয়া, এসো তো এই নদীটা কোথা থেকে এসেছে, আমরা দেখে আসি।

—সে তো অনেক দূরে!

—যত দূরেই হোক্ না, আমরা খুঁজে বার করবো।

—শেষ পর্যন্ত যাবেন তো?

—নিশ্চয়ই!

—দিদি আর তপনদা?

—ওরা থাক্। ওরা অতদূর যেতে পারবে না।

মণ্টু আর কেয়া লাফিয়ে ছুটে এলো আমার সঙ্গে। মণ্টু পরেছে সাদা হাফ সার্ট আর সাদা হাফ প্যাণ্ট, পায়ে কেড্‌সের জুতা। কেয়ার গায়ে একটা হলদে-কালোয় ডোরাকাটা ফ্রক। দুদিক থেকে ওরা আমার দু'হাত ধরলো, তপনের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে আমি ওদের নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওদের কথার কলকলানিতে আমি শুধু হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্ছি, আসলে রাগে আমার গা জ্বলছে। তপনের জন্য আমি সব কিছুই করতে রাজী ছিলাম কিন্তু এইরকম ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার—দুটি টকিং মেশিনের সঙ্গে কাটানোর কথা ভাবি নি। উরে বাপস্ কানে তালা লাগিয়ে দিল একেবারে! তখন আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স, তখন নিজের সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে ছাড়া কম বয়েসী বাচ্চাদের মানুষ

বলেই গণ্য করি না, বিশেষত যে বাচ্চারা চুপ-চাপ থাকতে জানে না, তাদের একেবারেই সহ্য হয় না। আমি চরম ধৈর্য্যের সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে যেতে লাগলাম হন্‌হন্‌ করে।

তবু সেইদিন আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলেই এই ঘটনাটা লেখা। প্রথমে কিছুক্ষণ আমি ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনে শুধু হুঁ-হাঁ করছিলুম। খানিকটা বাদে বাধ্য হয়েই শুনতে হলো। আস্তে আস্তে আমি টের পেলুম, ছেলেমেয়ে দুটি বিষম সরল। বরাবর ডালটনগঞ্জেই আছে, বড় শহর বলতে জীবনে শুধু দু-একবার রাঁচী দেখেছে, কলকাতা ওদের কাছে স্বর্গের মতন অলীক। ওদের সারল্য মানে বোকামি নয়, দুজনেরই বেশ বুদ্ধি আছে, কথা শুনলে বোঝা যায়। আমি টের পেলুম, এমন সুন্দর সরলা আমি আগে কখনো দেখিনি। ওরা সত্যিই বিশ্বাস করেছে। আমরা সত্যিই নদীর শেষ পর্যন্ত যাবো, দূরে কোথাও একটা পাহাড় আছে, আমরা তার চূড়ায় উঠবো, হয়ত সেখানে আমরা পথ হারিয়ে ফেলবো—তখন ধ্রুব তারা দেখে দিক ঠিক করতে হবে। মহা উৎসাহে ওরা কয়েক কদম দৌড়ে যাচ্ছে, কখনো হোঁচট খেয়ে পড়ছে বালিতে, আনন্দে গড়াগড়ি দিয়ে আবার লাফিয়ে উঠে বালি ঝেড়ে ফেলছে। অনেক দূরে চলে এসেছি, আস্তে আস্তে আমি ওদের মধ্যে কখন মিশে গেলুম, নিজেও টের পাই নি। ওদের দিকে চেয়ে একবার যেন আমার লুপ্ত শৈশবের কথা ভেবে বুক মুচড়ে উঠলো। তপন আর শান্তার কথা একেবারেই ভুলে গেলুম।

সেদিকে কোনো জনবসতি নেই, নদীর দু'ধারে জনাই আর সর্ষের খেত, আস্তে আস্তে আলো ম্লান হয়ে আসে। আমার মনে হলো, এখানে আর কেউ দেখার নেই, এখানে আমি ইচ্ছে করলেই নিজের শৈশবে ফিরে যেতে পারি। আমি ছুটতে লাগলুম ওদের সঙ্গে শূন্যে লাভ দিয়ে ইচ্ছে করেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম বালিতে, ওদের খল্‌খল্‌ হাস্যের সঙ্গে আমার কণ্ঠ মিলে গেল। মুখে মুখে গল্প বানাতে লাগলুম আমরা, আমার নিজেরও যেন বিশ্বাস হয়ে

গেল, সত্যিই আমরা নদীর শেষ দেখতে যাবো। একটা আশ শ্যাওড়ার ডাল দু'টুকরো করে ভেঙে নিয়ে তরোয়ালের মতন বাগিয়ে ধরলুম আমি আর মণ্টু, কেয়া যেন রাজকন্যা, যদি কোনো দৈত্য আসে তাহলে আমরা এই রকমভাবে লড়াই করবো—এই-বলে সেই হাওয়ার মধ্যে অদৃশ্য দৈত্যের বিরুদ্ধে শপাশপ্ করে তলোয়ার ঘোরাতে লাগলুম।

সেইদিন কিছুক্ষণের জন্য নিজের শৈশবে ফিরে গিয়ে আমি তীব্র আনন্দ পেয়েছিলাম। সেইদিনই বুঝেছি, প্রেম কিংবা বন্ধুত্বের চেয়েও সরলতার সান্নিধ্যে যে আনন্দ, তা আরও অনেক বেশী গভীর।

॥ ১৩ ॥

শীতকালের কয়েকটা মাসও যদি মুখ গোমড়া করে থাকতে হয়, তা হলে আর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। সারা বছরে এই তো দু-তিনটে মাস সকলে মিলে একটু এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে থাকি, বাইরে বেরুলেও বৃষ্টি বাদলার ঝামেলা নেই। বাজারে সজীব টাটকা তরিতরকারী ওঠে, স্বাস্থ্যবান ফুলকপি বাঁধাকপি দোকানে দোকানে ঝলমল করে, মাছের দোকানে পচা গন্ধ পাওয়া যায় না। অন্যান্য বছর দেখেছি, এই সময়টায় অন্তত ব্যবসায়ীদের শুভেচ্ছার মুখে ছাই দিয়ে সব জিনিসপত্রেরই দাম কমে। রেশন ব্যবস্থার দশা যাই হোক, চাল পাওয়া যায়। রাস্তায় রাস্তায় রঙীন পোশাকে শহরের রূপটা বদলে যায়। খেলার মাঠে ভিড় হয়। লোকে কখনো কখনো হাসে।

কিন্তু এবার কি হলো? প্রকৃতি ও সমাজ এবার খেলার নিয়ম বদলে ফেললো কেন? শীত আসবে আসবে করেও পুরোপুরি আসছে না। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। বর্ষাকাল

শেষ হবার পরও যখন তখন বৃষ্টি। ক্যালেণ্ডারে ডিসেম্বর মাস অথচ সারা দিন আকাশে রোদ নেই, এ রকম দেখিনি বহুদিন।

প্রত্যেকবারই দেখেছি, গ্রীষ্মকালে যা কিছু আন্দোলন আর ধর্মঘট আর মিছিল শুরু হয়। যত গরম বাড়ে, তত বাড়তে থাকে দাবিদাওয়া। হরতাল ডাকা বর্ষাকালে। সরকার এবং বিরোধী পক্ষগুলি জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দেখে আকুলি বিকুলি করার জন্য দারুণ প্রতিযোগিতায় মাতে। এই ফাঁকে ব্যবসায়ীরা মনের আনন্দে জিনিসপত্রে দাম বাড়ায়। তারপর পূজোর কিছুদিন আগে পর্যন্ত বোনাসের দাবি নিয়ে খুব হৈ হৈ চলে। পাড়ার ছেলেরা চাঁদার জন্য জুলুম চালিয়ে যায়। তারপর পূজো একবার এসে পড়লে সব পক্ষেই সাময়িক যুদ্ধবিরতি। আস্তে আস্তে আকাশ নীল হয়ে আসে, বাতাসে মিহিন শিরশিরে ভাব আসে, তোরঙ্গ আলমারি থেকে বেরুতে শুরু করে ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা গরম জামা। শীতকালটাই উপভোগের সময়।

এবার বর্ষাকালটা সুদীর্ঘ হয়ে আচ্ছন্ন করে দিল শরৎ ও হেমন্ত। শীতের সময়েও তার হামলা চলছে। জিনিসপত্রের দাম এবার যেন কমবেই না ঠিক করেছে। এবার শুধু ব্যবসায়ীরাই জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছেন না, সরকারও প্রতিযোগিতায় মেতেছেন। প্রথমে পেটরোল, তারপর বাস ভাড়া—আরও অনেক কিছু আসছে।

কিন্তু এ-সব কি শীতকালটায় করার দরকার ছিল? মার্চ মাসে বাজেটের আগে সব কিছুরই দাম বাড়ে, তখনকার জন্য এই সব জমা রাখলে চলতো না? এই শীতকালেই আবার একদিন হরতাল হয়ে গেল।

আমি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, আর দেখতে পাই কোথাও মানুষের মুখে হাসি নেই। ঠিক গ্রীষ্মকালের মতনই বিরক্ত ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখ। কে কখন বাড়ি ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই। বৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন গাড়িবারান্দা বা শেডের তলায় দাঁড়িয়ে

আছে গোছা গোছা বিষণ্ণ মানুষ। এরকম অভিশপ্ত শীতকাল আগে কখনো দেখিনি।

বাজারে সাধারণত সব জিনিসই আমি চেনাশুনো নির্দিষ্ট দোকানীর কাছ থেকে কিনি। বাড়ির বেকার ছেলে হিসেবে আমাকে নিয়মিতই বাজারে যেতে হয়। আমার বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই বাজারে যাওয়া পছন্দ করে না, অনেকে বাজারের ভেতরটা কি রকম দেখতে হয় তাও চোখে দেখেনি, কিন্তু আমার তো সে দায় নেই। একদিন একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বাজারের মধ্যে দেখা, সে আমাকে দেখে আগেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললো, আমি ফার্ন রোডে যাবো তাই বাজারের মধ্যে দিয়ে শর্টকার্ট করছি, আমি বাজারে আসিনি। আমি তাকে হেসে বলেছিলাম, আমি তু, বাজার করতেই এসেছি।

যাই হোক, বহু বছর ধরে বাজার করবার ফলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, চেনা লোকের কাছ হেকে কিনলে কম হয়। বাজারে গিয়ে শস্তায় জিনিস কেনাই আসল কথা নয়, ভালো জিনিস খুঁজে বার করাই কঠিন। দোকানদাররা লোককে ওই ব্যাপারে ঠকায় না।

তরকারির দোকানদারের কাছাকাছি আসতেই দোকানী উৎসাহিত হয়ে বললো, 'এই যে বাবু আসুন!'

শীতকালের উপযোগী প্রকৃত স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী বেগুন টমাটোর ওপর হাত রেখে সে বললো, এই দেখুন, ভালো ভালো জিনিস আছে।

আমি বললাম, কিন্তু দাম তো সেই গত সপ্তাহের মতন দু' আছে?

সে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো।

আমি তার চোখে চোখ ফেলতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই আমার দিকে তাকাবে না। একেই বোধ হয় চক্ষুলজ্জা বলে। আর কথা না বলে ওর কাছ থেকে জিনিস কিনে চলে এলাম।

এই সময় ভালো নারকোল ওঠে। নারকোল কিনি এক রমণীর কাছ থেকে। এই স্থূলকায় হাসিখুশী রমণীটির সঙ্গে দরদাম করে কিছুক্ষণ সময় বেশ ভালোই কাটে। এই দরাদরির ব্যাপারটা অনেকটা খেলার মতন; কারণ শেষ পর্যন্ত সে তার দামে ঠিকই এঁটে থাকবে এবং জিনিসটা ভালো দেবে। ওর কাছ থেকে আমি কোনোদিন হালকা নারকোল পাইনি।

নারীটি আমাকে বললে, কই আজ নারকোল নেবেন না?

দুটি নারকোল সে তুলে ধরলো। এবং নিজেই জানালো, এর মধ্যে একটি নারকোল এখনো নরম আছে, কাঁচা খাওয়ার পক্ষে অতি উপাদেয়।

—কত করে জোড়া?

সে হেসে বললো, ছ' টাকার এক পয়সাও কম নয়।

হাসি শুনেই বুঝলাম, এটা আসল দাম নয়। ঠাট্টা। নারীটি হাসতে ভালবাসে, সে এইভাবে রসিকতা করছে। বাজারে যারা দোকান সাজিয়ে বসেছে, তারা যে সবাই শুধু নীরস কেনাবেচা করতে চায়, তাই-ই নয়। অনেকেরই হাস্য পরিহাস বোধ আছে।

আমি নারকোল-নারীকে বললাম, আমি ওসব শুনতে চাই না। গত বছর শীতকালে নারকোলের জোড়া কত ছিল?

হাসি মুছে গেল তার মুখ থেকে। তার বদলে ফুটে উঠলো রাগ! অনেকের দুঃখের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় রাগে। সে প্রায় মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, সেসব দিনকাল কি আর আছে? গত বছর সব জিনিসই শস্তা ছিল।

কোনো বছরেই লোকে মনে করে না যে তারা খুব সুখে আছে। সব সময়ই মনে হয়, আগের বছরটা তবু ভালো ছিল। গত বছরেও লোকে জিনিসপত্র কোনো স্বর্গরাজ্যের দামে পায়নি কিন্তু এবছর দুর্দশাটা যেন লাফিয়ে উঠছে।

জেরা করে ঐ নারীর কাছ থেকে জানা গেল যে, গত বছর ঐ নারকোলের জোড়া ছিল আড়াই টাকা। এবছর চার টাকার

কমে কিছুতেই নয়। তবে আমাকে সে কেনা দামে সাড়ে তিন টাকায় দিতে পারে।

এর পর থেকে সে একবারও হাসলো না।

এরপর গেলাম মাছওয়ালার কাছে। দু' তিনজন অল্পবয়েসী ছেলে সব সময় হৈ হৈ করে। আমাকে দেখেই ডাকাডাকি করতে লাগলো যথারীতি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি, পোনামাছ সেই বার টাকাই তো?

ছোকরা কয়েকটি ঠোঁট উল্টে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করলো। তারপর বললো, আজ চোদ্দ টাকা উঠেছে।

বেশী দামে জিনিস বিক্রী করায় এরা কেউ খুশী নয়। কালোবাজারী কিংবা অসাধু ব্যবসায়ী যাদের কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, তাদের কিন্তু আমরা চিনি না, কখনো চোখে দেখিনি। যাদের আমরা চোখে দেখি, খুচরো দোকানদার—জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য এদের কোনো উল্লাস নেই। তবু প্রত্যেক শীতকালেই এদের একটু চাঙ্গা হতে দেখি, কিছুদিনের জন্য অন্তত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনো রেশারেশি থাকে না। গত বছর এই সময় আমাকে একটি আস্ত মাছ গছিয়ে দেবার জন্য এই ছেলেগুলো ঝুলোঝুলি করেছে, এবছর মুখ ফুটে কিছুই বললো না।

একজন জিজ্ঞেস করলো—দাদা, আজকাল আপনাকে প্রায়ই দেখি না। কেন? রোজ আসেন না?

আমি বললাম, একদিন অন্তর একদিন আসি আজক'ল। জিনিসপত্রের দাম ডবল করে আমাকে কেউ কাবু করতে পারেনি।

॥ ১৪ ॥

অনেক কিছুই বদলায়, বদলায়নি শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের বিস্ময়। এবং আনন্দিত হবার ক্ষমতা। নতুন জামায় এখন সব বাচ্চাদের মুখ নতুন। আকাশের রং নীল, মেঘের রং শাদা কিংবা কালো—কিন্তু এক এক সময় মেঘ ভেঙে এমন অদ্ভুত রং বেরোয়—যার কোনো বর্ণনা হয় না। খুশী ঝলমল্ বাচ্চাদের মুখগুলোও এখন সেইরকম।

সকালবেলা চেয়ারে শরীর এলিয়ে টেবিলের ওপর পা দু'খানা কাঁচি করে তুলে ডিটেকটিভ বই পড়ছিলাম। নীলনদের ওপর খুনী তরুণীর চতুরতা ও বৃদ্ধ বেলজিয়ান গোয়েন্দার আখখুটেপনায় এমন মগ্ন হয়েছিলাম যে, মনেই পড়েনি আজ পূজোর প্রথম দিন, আজ একটা বিশেষ দিন। অনেকগুলো কচি গলার কলরবে পড়ায় ব্যাঘাত হলো, বই মুড়ে রেখে বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়ালাম।

চোখে অনেকগুলো রঙের ঝলক লাগলো। প্রথমেই মনে হয়, বাঃ ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সত্যিই খুব উন্নতি হয়েছে। এত সুন্দর সুন্দর রঙের জামার কাপড় ও শাড়ী বেরিয়েছে এ বছর—কোয়ালিটিতেও পৃথিবীর যে-কোনো দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আমরা ছেলেবেলায় একটা চেন লাগানো হলুদ গেঞ্জি পেয়েই খুশীতে ডগমগ হতাম, এখন কি দুর্দান্ত একটা নাইলনের গেঞ্জি পরেছে ঐ বাচ্চা ছেলেটি—সেরকম হলুদ গেঞ্জি ওকে দিলে নিশ্চয়ই ছুঁড়ে ফেলে দিত—কিন্তু আনন্দটা একরকম।

এই সকালেই স্নান টান করে সেজেগুজে বেরিয়েছে, অথচ আমি চোখে মুখে একটু জল ছুঁইয়েছি মাত্র। টুথপেসটের স্বাদটা মুখ থেকে তাড়াবার জন্য দু'তিন কাপ চা খেতে হয়, আবার চায়ের স্বাদ তাড়াবার জন্য সিগারেট। অন্য যে-কোনো দিনেরই মতন, পূজোর

দিনটার জন্য আলাদা কোনো প্রস্তুতি নেই। এখন পুজোর দিনগুলো যত না আনন্দের, তার চেয়ে বেশী ভয়ের। বাড়ির পাশেই বারোয়ারি পুজো। যেদিন থেকে প্রথম ম্যারাপ বাঁধা শুরু হয়েছে, বাড়িতে যে-কেউ এসেই প্রথম কথা বলেছে, 'বাড়ির পাশেই পুজো, সর্বনাশ!' সর্বনাশেরই তো কথা—ভোর থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত মাইকের বিকট চিৎকার, হিন্দী গানের উৎপাতে পাগল হয়ে যাওয়ার কথা।

অথচ এক সময় তো আমরাও পুজোর অনেকদিন আগে থেকে পুজোর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, যত দিন এগিয়ে আসতো-ততই যেন অধীর হয়ে উঠতাম।

আমার ছেলেবেলায়—খুব বেশীদিন আগের কথা নয় যদিও, তবু তখন বারোয়ারি পুজো এত ছিল না। কলকাতার মানুষ তখনও এতটা নাগরিক হয়ে যায়নি। পুজোর সময় অর্ধেক কলকাতা ফাঁকা হয়ে যেত—তখন প্রায় সবারই একটা 'দেশ' ছিল, কারুর পদ্মাপারে, কারুর রংপুর, বর্ধমান, মেদিনীপুর—পুজোর ক'টা দিনের জন্য গ্রামে ফিরে যেত অনেকেই। আমিও পদ্মাপারের এক ছোট্ট নিরীহ গ্রামে পুজোর পনেরো কুড়িদিন আগে থেকে দেখতাম মূর্তি গড়া। কুমোরটুলি থেকে হঠাৎ পঞ্চমীর দিন সিংহ-অসুর সমেত আস্তো ঠাকুর নিয়ে আসা নয়—বাড়িতেই তৈরী হতো খড়ের মূর্তি তারপর একমেটে, দোমেটে করে।

ঠাকুর দালানে দোমেটে মুণ্ডহীন মূর্তিগুলো ফাটা ফাটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, সকাল-বিকাল একবার করে দেখে যেতাম আমরা। যেদিন সাদা রঙের পোচ পড়তো, বুঝতাম পুজোর আর দেরী নেই। তারপর নৌকো করে আসতো হেড-কুমোর জলধর। জলধরের নৌকোটি মনে হতো এক রহস্যময় জগৎ, অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটা নারকেলের মালায় গোলা থাকতো রং, সেগুলো ঝুলতো নৌকোর ছইয়ে। বেঁটে কালো কুৎসিৎ চেহারা লোকটার। কিন্তু বড় দাম্ভিক, মূর্তির মুখ তৈরী করার সময় কারুর সঙ্গে একটাও কথা

বলতো না। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মুখ হতো ছাঁচে, কিন্তু মা দুর্গার মুখখানা সে তৈরী করতো নিজের হাতে। একতাল মাটি নিয়ে অনবরত দু'হাতে টিপছে আর কি যেন বলছে বিড়বিড় করে। আমাদের সবারই ধারণা ছিল জলধর মন্ত্র জানে, নইলে একতাল মাটি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ওরকম অপরূপ মুখ বানিয়ে ফেলে কি করে? নারীরই মুখ, অথচ আর কোনো নারীর ওরকম মুখ হতে পারে না—কি যেন একটা অপার্থিব ব্যাপার আছে।

আমাদের আর একটা কাজ ছিল, চারটি পাঁঠাকে রোজ ঘাস খাওয়ানো। অষ্টমীর দিন দুটো আর সপ্তমী-নবমীতে একটা করে বলি দেওয়া হবে। এক মাস আগে থেকে সেগুলো কিনে রাখা হতো।

শৈশবে সবাই নিষ্ঠুর থাকে—বয়স্কদের চেয়েও শিশুরা বেশী নিষ্ঠুর, নিজের হাতে ঘাস খাওয়ানো ঐ পাঁঠাগুলোকে বলি দেবার সময় খুব তো কষ্ট হতো না! এখন কলকাতার বারোয়ারি পূজা মণ্ডপে পাঁঠা বলি দেখলে সে বীভৎস দৃশ্যে শিউরে উঠতাম। আশ্বিন মাসে খেত ভরা কচি ধানগাছ, কি ধারালো হয় ধানের পাতা, হাত কেটে যায়, কিন্তু পাঠারা ঐ ধান খেতেই ভালোবাসে বেশী। গলায় দড়ি বেঁধে পাঁঠাগুলোকে নিয়ে ছুটতাম, বুড়ো তাহের আলি ডেকে উঠতো, ওকি দাদাভাই, অমন করে ছোটায় না, গলায় দাগ পড়ে যাবে—ঠাকুরের পুজোয় খুঁতি পাঁঠা দিতে নেই।

এখন গম্ভীর কেজো কর্কশ বয়স্কদের জগতে চলে এসেছি। এখন আর পূজোর দিনে আমি স্নান করে নতুন জামা কাপড় পরে বেরুবো না। পাড়ায় পূজা মণ্ডপে জমে উঠছে ভিড়, ছেলেদের লাইন —মেয়েদের লাইন সামলাতে ব্যস্ত ভলানটিয়াররা, এই ভিড়ে কেউ কেউ ইচ্ছে করে হারিয়ে যাচ্ছে, ঢাকের বাজনা বাতাসের স্তর ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যায়, জলে উঠবে আলোর মালা—শাড়ী ও প্রসাধনের এক দীর্ঘস্থায়ী প্রদর্শনী হবে সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত— চারদিকে একটা খুশী খুশী হাওয়া। তবে, সকালে বাচ্চা ছেলে—

মেয়েদের মুখে মেঘ ভাঙা আলোর মতন যে আনন্দ দেখলাম তার কোনো তুলনা নেই। শৈশবই সবচেয়ে পবিত্র আনন্দ ও বিস্ময়ের কাল। যে শৈশব আমি হারিয়েছি আর কখনো ফিরে পাবো— এ কথা আমার মতন আরও সব বড় হয়ে যাওয়া মানুষদের মনে পড়ে না পূজোর দিনে?

॥ ১৫ ॥

'হ্যাঁরে, বিদেশে ভিখিরি ছিল?' মা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'—কেন, আমিই তো ছিলাম!' তবে আমি একা নয়। আরও ছিল। শিকাগোর রাস্তায় যে লম্বা মতন লোকটা কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করতো, ও কে?

যে-কোনো নতুন লোকেরই শিকাগো শহরে প্রথম কয়েকটা দিন ভয় ভয় করবে। এমন সব রোমাঞ্চকর গল্প শিকাগো শহরের সম্পর্কে আগে শুনেছি, বিখ্যাত গুণ্ডা আল-কাপনের জায়গা, যেখানে দিনে-দুপুরে ডাকাতি হতো। এখন অতটা হয় না ঠিকই, কিন্তু একেবারেই নিরুপদ্রব পৃথিবীর কোনো বড় শহরই নয়, প্রায়ই মারাত্মক দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ডের খবর শিকাগো থেকে আসে। সুতরাং বাক্‌সর্বস্ব এই বঙ্গ-সন্তান প্রথম কয়েকদিন ভয়ে সরু হয়ে পথ হাঁটতুম।

প্রায়ই একটা দশাসই নিগ্রো বিনয়ে নিচু হয়ে কানের কাছে গুণগুণ করে কী বলতো। সে পাশে পাশে আসতো সাউথ ওয়াবাস্‌ এভিনিউর মোড় পর্যন্ত তারপর আর দু'জন তার জায়গা নিতো। সেই একই রকম পাশে পাশে গুনগুন। একটি অক্ষরও বুঝতে পারতুম না, নমস্কারের ভঙ্গিতে বার বার 'থ্যাঙ্ক য়ু' 'থ্যাঙ্ক য়ু' বলে সুট্ করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তুম।

কী চায় ওরা বুঝতে না পেরেই অমন অস্বস্তিতে ছিলুম। বিলেত দেশটা মাটির হলেও আমেরিকা দেশটা তো সোনার।

তবে, আমার মতো কাদা-মাটির দেশের মানুষের কাছে কি গূঢ় দাবি থাকতে পারে ওদের। গলির মোড়ে মোড়ে বা কফিখানায় একদল সুসজ্জিত ছোকরাকে দুপুরে জটলা করতে দেখতুম, দেখে মনে হয় বেকার। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে আমার পঞ্চাশ গজের মধ্যে মাত্র পাঁচ মিনিটে বিয়ারের বোতল ছোঁড়াছুড়ি করে দুই দলে রোমহর্ষক মারামারি হয়ে গেল।

একা রাস্তায় ঘুরলেই সেই ফিস্‌ফিসানিদের পাল্লায় পড়তাম। ক্ষীণ সন্দেহ হতো, পৃথিবীর সব শহরেই, বিদেশীদের নিষিদ্ধ প্রমোদ ভবনে নিয়ে যাবার জন্য এক ধরণের লোক থাকে, ওরাও কি তাই? কিন্তু, বলা বাহুল্য ওসব জায়গায় যাবার ঝুঁকি নিতে আমার মোটেই শখ্ ছিল না। যাই হোক ক্রমে সব রকম উচ্চারণ যখন কানে সড়গড় হয়ে গেল, তখন আমি একটু ভরসা করে দাঁড়িয়ে সেই লম্বা লোকটার কথা শুনলুম, অত্যন্ত বিনীত সুরে সে বলছে: আ ডাইম প্লিজ!

ওঃ, মোটে একটা ডাইম! (অর্থাৎ ওখানকার দশ নয়া পয়সা, আমাদের বারো আনা) ভিক্ষে চাই! তা হলে তো তুমি আমার চেনা লোক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। পকেট থেকে একটা ডাইম খসিয়ে ওরকম আনন্দ কখনও পাইনি।

সানফ্রান্সিস্কোর মতন অমন রূপসী নগরী দুনিয়ায় ক'টা আছে জানি না। অল্প শীতের দুপুরবেলা উপসাগরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলুম। পথে একটি দর্শনীয় চেহারার মানুষ চোখে পড়ল। অতিশয় লম্বা, বৃষস্কন্ধ শালভুজ। বয়েস সত্তরের কম না, কিন্তু কি সবল শরীর। প্রায়-সব-সাদা ঝোপ দাড়ি, লম্বা চুল, পোষাক দেখলে মনে হয় যেন ঐ পোশাক পরেই লোকটা রাত্তিরে শোয়। যেন একটি প্রাচীন নাবিক, হঠাৎ ক্যাপ্টেন এহাবের কথাই মনে পড়েছিল আমার। কিন্তু এহাবের মতো অহঙ্কারী সে মোটেই নয়, বরং কোল্‌রিজের সেই বুড়ো নাবিকের মতোই সে হঠাৎ আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ভারতীয়?

ততদিনে আমি আমেরিকার কথাবার্তার ধরন ঢের জেনে গেছি বললুম, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের 'ভারতীয়' নয়' খাঁটি ভারতবর্ষের ভারতীয়।

লোকটি বললো, আমি ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম। চমৎকার দেশ। গান্ধী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তুমি কোথায় যাবে, চলো, আমিও একটু তোমার সঙ্গে হাঁটি।

হাঁটতে হাঁটতে লোকটা বললো, গান্ধীর মতন লোক হয় না, সত্যি। আমি ওর অনেক লেখা পড়েছি। গ্রেট ম্যান—তারপরই লোকটি আমার কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বললো, তোমার কাছে একটা সিকি (কোয়ার্টার) হবে?

আমি স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো লোকটির হাতে একটা সিকি তুলে দিলুম। লোকটি দরাজ গলায় আমাকে বললো, গড্ ব্লেস ইউ, মাই সান্। তার পরই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়লো, লণ্ডনে ভারতীয়দের মধ্যে একটা রসিকতা চালু আছে যে, রাস্তায় কোনো অপরিচিত লোক যদি হঠাৎ এসে বলে যে, 'নেহরু খুব ভালো লোক' বা 'গান্ধী একজন সত্যিকারের মহাত্মা', তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে এড়িয়ে চলা উচিত। লোকটা নিশ্চিত কোনো মতলববাজ, কিংবা ভিখিরি।

ঐ সানফ্রান্সিস্কোতেই আর একজন মজার ভিখারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। কলম্বাস এভিনিউতে লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে এক দোকানে বসে এসপ্রেসো কফি খাচ্ছিলুম, পাশে আর একটি খোঁচা-দাড়ি বুড়ো বসে খুব বক্‌বক্ করছিল। সাহিত্য, জীবন, ভগবান ইত্যাদি সম্বন্ধে। হঠাৎ এক সময় লোকটা হাই তুলে বললো, চারটে বাজলো! বাবা!—তার পরই আমার দিকে ফিরেঃ তোমার কাছে খুচরো আছে?

ভাবলুম লোকটা টাকা ভাঙাতে চায়। কোটের পকেটে হাত দিয়ে বললুম, না পুরো হবে না, আমার কাছেও ডলারের নোট।

লোকটা উদার হেসে বললো, না, না, আমি আস্ত এক ডলার কারুর কাছ থেকে নিই না। ও খুচরো যা আছে, তাই দাও।

ফোর্লিংগেটি বললো, ও কি হচ্ছে ডন্, ছি ছি, ও একজন গরীব ভারতীয়, তাও কবি, ওর কাছ থেকে তোমার নেশার পয়সা না নিলে চলে না!

লোকটা বললো, তুমি ভারতীয়? আচ্ছা, তোমার পয়সা আমি শোধ দিয়ে দেবো। ঠিক দেবো, কোনো না কোনো দিন। আমি কথা দিয়ে কথা রাখি।

ওকে বলা হয়নি, আমি সেদিন ওখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মেয়ে ভিখারীর দেখা পেলাম নিউইয়র্কে। গ্রীনিচ ভিলেজ থেকে ইস্ট সাইডে যেতে প্রায়ই একটি মাঝ বয়েসী মেয়ে নিঃশব্দে হাত পেতে থাকতো। পর পর তিন দিন তাকে আমি একটি করে নিকেল দিলাম। তাই দেখে আমার বন্ধু অ্যালেন হেসে বললো, কি, খুব মজা লাগছে বুঝি ভিক্ষে দিতে! একটা প্রতিশোধ! এত বড়লোকের দেশেও ভিখিরি।

আমি বললুম, না, এরা তো আমার চেনা লোক। একেবারে ভিখিরি না থাকলেই বরং দেশটা একেবারে কাঠ কাঠ লাগতো।

—এরা কিন্তু বেশির ভাগই নেশাখোর। না খেতে পাওয়া ভিখিরি প্র্যাকটিক্যালি এ দেশে নেই।

—সে যাই হোক, ভিক্ষে কেন করছে এটা বড় নয়। ভিক্ষে চাইছে, এটাই আনন্দের খবর। সবাই পরিশ্রম করবে, তার কি মানে আছে। যে হিসেবে সাধু-সন্ন্যাসীরা ভিখিরি, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। অবশ্য, আমাদের দেশের বেশির ভাগই বাধ্য-হওয়া খেতে না পাওয়া ভিখিরি।

ঠিকই এদেশে আরও বেশী ভিখিরি থাকা উচিত ছিল। বেঁচে থাকা এখানে এত সহজ।

লণ্ডনের হাইড পার্ক কর্নারে প্রায় সন্ধ্যেবেলা বক্তৃতা হয়। নানান জায়গায় যে ইচ্ছে বক্তৃতা দেয় পৃথিবীর হেন বিষয় নেই যা

নিয়ে ফাটাফাটি হয় না রোজ। একজন লোক ছিল ভারী মজার, সারা হাতে মুখে উল্কি, ফ্যাসফেসে গলা—চুরি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই বিষয়ের ভিত্তিতে সে তার জীবনের নানান চৌর্যকর্মের বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা দেয়। একদিন মাঝপথে বক্তৃতা থামিয়ে হঠাৎ দুঃখিত গলায় বললো, আজকাল চুরির বাজার বড় মন্দা, যাই হোক, আসে পাশে পুলিস নেই—আপনারা ঝটপট আমাকে দু'চার পেনি করে ভিক্ষে দিন তো!

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশে খুব দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি পেলেও, ভিক্ষের রেট খুব বাড়েনি। এখনও বুলি সেই পুরোনো, 'মা, একটা পয়সা ভিক্ষে দিন।' বড় জোর আধুনিক ছেলে-ছোকরা ভিখিরিরা দু'পয়সা চায়। বিদেশের ভিখিরিরা কিন্তু চার-আনা আট-আনার কম কথাই বলে না। এক সময় শ্যামবাজারে একটি সত্যিকারের স্টাইলিস্ট ভিখারী দেখতাম। একটি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ছোকরা, প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা, বোধ হয় আধপাগলা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে লোক নির্বাচন করে নিয়ে—সেই লোকের কাঁধে টোকা দিয়ে বলতো, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে। হতচকিত কোন লোক যদি থেমে যেত, তাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলতো, আপনার কাছে একটা স্পেয়ারেবল্ দোয়ানি হবে? আমার শর্ট পড়ে গেছে।

কি জানি ছোকরাটা বিলেত ফেরৎ কিনা! কারণ, বিলেতে অনেক ভিক্ষার্থীর মুখে 'স্পেয়ারেবল্' শব্দটা শুনেছি।

প্যারিসেও দেখেছি মাটির তলায় ট্রেনের রাস্তায় হাত পেতে নিঃশব্দে বসে আছে। কেউ অথর্ব, কেউ হাত-পা কাটা। কেউ ব্যাঞ্জো বাজায়, কেউ চোখে চোখ ফেলে করুণ মিনতি করে। আর যেখানেই রিফিউজি, সেখানেই ভিখারী। প্যারিসে কিছু আছে আলজিরিয়ার রিফিউজি। একদিন দেখি, একটা ছোট্ট পার্কে ওয়াইনের বোতল সঙ্গে নিয়ে একজন কেক্ খাচ্ছে—আশেপাশে দু-তিনটে রিফিউজি ছোকরা ছুকরি ঘুর ঘুর করতে লাগলো।

একজন শেষে বলেই ফেললো, তার নাকি ওয়াইন সর্ট পড়ে গেছে, কেক্ খেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, সুতরাং সে যদি একটু—।

রোমে একটা লোক এসে বললো, তুমি বোতাম কিনবে?

—না, ধন্যবাদ।

—ক্যালেণ্ডার কিন্‌বে?

—না, ধন্যবাদ।

—দেন, প্লিজ হেল্‌প্‌ মী টেন লীরা। প্রত্যেক জায়গাতেই আমি এ-সব শুনে খুশি হয়েছি। কারণ, ওসব দেশে, এত অসংখ্য লোক আমাকে অকারণে সাহায্য করেছে।

দেশে ফেরার পরের দিন গলির মোড়ে পুরোনো বৈরাগীকে দেখতে পেলাম, খঞ্জনি বাজিয়ে আগমনী গান গাইছিল: 'যাও যাও গিরি আনতে গৌরী, উমা কত মা মা বলে কেঁদেছে।' আমাকে দেখে একগাল হেসে বললো, খোকাবাবু ভালো আছো, কদ্দিন দেখিনি। দাও, গরীবকে একটা পয়সা দাও।

পকেটে হাত দিলাম। হা-কপাল। একটাও পয়সা নেই। সত্যিই নেই।

॥ ১৫ ॥

ছেলেবেলায় আমার খুব সিনেমা দেখার ঝোঁক ছিল, এখন একেবারেই নেই। মনে আছে, কানন দেবী ও অশোককুমার অভিনীত বাংলা 'চন্দ্রশেখর' ছবিটি যখন মুক্তি পায় তখন আমি স্কুলের ছাত্র—ছ'বার না সাতবার দেখেছিলাম ঐ ছবিটা। মাঝে মাঝেই বাড়ির কাছাকাছি শ্রী বা উত্তরা হলে সাড়ে ছ' আনার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তাম। মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল দৃশ্যগুলো তবু প্রত্যেকবারই বেশ উপভোগ করতাম। অতবার দেখে ছিলাম বলে এতদিন পরেও ফিলমটি বেশ মনে আছে এবং এখন পরিণত বিচারে বুঝতে পারি, ফিলমটি বেশ খারাপই হয়েছিল। 'চন্দ্রশেখর'

যখন ফিলমে দেখি, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটি পড়িনি। মূলকাহিনী থেকে ফিলম অনেক দূরে সরে গিয়েছিল বলে সেই সময় বেশ সোরগোল উঠেছিল (যেমন প্রায়ই ওঠে), সেই সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটি পড়ার আগ্রহ হয় খুব। স্কুলের ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্রের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সুপাচ্য নয়, তবু পড়েছিলাম। এবং যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলাদাভাবে জোগাড় করেছিলাম, তাই অন্য উপন্যাসগুলিও পড়তে শুরু করি, বঙ্কিমচন্দ্র আমার জীবনে এসে গেলেন।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারতো যে 'চন্দ্রশেখর' জাতীয় ফিলমগুলি মানুষকে সাহিত্য পাঠে উদ্বুদ্ধ করায়—এই একটা উপযোগিতা তো আছে। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। আমি ছেলেবেলা থেকেই গ্রন্থকীট, তখন ডিটেকটিভ ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীই বেশী পড়তাম বটে, কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে 'বড়দের বই' পড়ার ব্যাপারেও বেশ ঝোঁক ছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অনতিবিলম্বে পড়তামই। সুতরাং এই যোগাযোগকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কৈশোরের বিস্ময়কে কিছুটা আলোড়িত করা ছাড়া শিল্প হিসেবে চন্দ্রশেখর জাতীয় ছবির বিশেষ কোনো মূল্য নেই।

স্কুল পেরোবার পর সিনেমা দেখা আস্তে আস্তে কমে আসে, কিন্তু একেবারে বাদ দিইনি। বাংলা ছবি দেখতাম বেছে বেছে, ইংরেজি সিনেমার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ দিনেই ছুটে গিয়ে লরেন্স অলিভিয়েরের অভিনীত ও পরিচালিত 'হ্যামলেট' দেখেছিলাম—অনতিবিলম্বেই এ ছবিটা তিনবার দেখা হয়ে যায়—তখন কোনো বাংলা ছবি একাধিকবার দেখার কথা চিন্তাই করতে পারি না—নেহাৎ কোনো নারী অনুরোধ না করলে—সেরকম অনুরোধও যে বিশেষ পাইনি, বলাই বাহুল্য। বাংলা ফিলমের চেয়ে ইংরেজি ফিলমের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশই বাড়তে থাকে, বাংলার নায়ক-নায়িকাদের বদলে বিদেশী নায়ক-নায়িকারা মন অধিকার করে নেয়—অরসন ওয়েলস, রোনাল্ড কোলম্যান,

জেমস মেসান, মনটগোমারি ক্লিফট প্রভৃতি অভিনেতাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি না জানলে আশ মিটতো না। বেশ কয়েক বছর আমি ইনগ্রিড বার্গমান ও অড্রে হেপবর্ন-এর প্রেমিক ছিলাম, গ্রেস কেলী যখন ফিলম ছেড়ে এক রাজকুমারকে বিয়ে করে প্রিন্সেস গ্রেস হলেন তখন মনে গভীর দুঃখ পেয়েছিলাম। বাংলা ছবি তখন যা দেখি, তার অধিকাংশই সাহিত্য থেকে তৈরী করা ফিলম। বাংলায় শুধু ফিলমের জন্যেই তৈরী করা যেসব গল্প, তা এমনই গোঁজামিলে ভর্তি যে বেশীক্ষণ সীটে বসে দেখা যায় না। সেসব গল্পে বিয়ের রাত্রে বাসরঘর থেকে বৌ পালিয়ে যায়, অন্ধ হঠাৎ দৃষ্টি ফিরে পায় ক্লাইম্যাক্স সীনে, স্মৃতি নষ্ট ও ফিরে পাওয়াও পূর্ববৎ, নায়িকার বাবার ড্রেসিং গাউন পরা বাধ্যতামূলক ইত্যাদি। মানুষের জীবনে এরকম উদ্ভট ব্যাপার ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু তার যথাযথ পটভূমিকা না থাকলে কিংবা শুধু কাহিনীর প্রয়োজনে এসব ঘটনা আনলে গা রি রি করে। বাংলা সিনেমায় সাহিত্য থেকে নেওয়া কাহিনীগুলিতে তবু মানবিক সম্পর্ক বা কাহিনীর গতিতে খানিকটা স্বাভাবিকতা থাকে। একটু রুচিবান দর্শকের কাছে শতকরা নিরানব্বইটি ইংরেজি-মার্কিনী ছবি শিল্প হিসেবে কিছু না—তবু সেখানে কাহিনী বা চরিত্রগুলির ব্যবহারে মোটামুটি সঙ্গতি পাওয়া যায়। মানুষের প্রবৃত্তির রহস্যেরও ইঙ্গিত থাকে—এমন কি সিনেমার জন্যই তৈরী করা গল্পেও।

যে-আমি কোন সময়ে সমস্ত বাংলা ছবি দেখতাম, কোনো কোনো বই একাধিবার, সেই আমিই যে এখন বাংলা বই প্রায় দেখিই না, এর কারণ কি? আমার সময়াভাব নয়। ফিলম সম্পর্কে আমার অনাসক্তিও জন্মায় নি। আমি বা আমার মতন এরকম আরও অনেকের। অনেকের মুখেই এরকম শুনেছি। তাহলে বাংলা ছবি কি আগেকার চেয়ে এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে? আমি তা বিশ্বাস করি না। অনেক প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধকে হা-হুতাশ করে বলতে শুনেছি, তাঁদের কালে বাংলা ছবি কত ভালো

ছিল, এখন আর সেরকমটি নেই। সেই কাননবালার মতন নায়িকা একালে কি একজনও আছে? কিংবা দুর্গাদাসের মতন নায়ক? আমরা অবশ্য সেকালের কিছু কিছু ছবি দেখেছি, সেসব ছবিকে একালের ছবির চেয়ে কোনোক্রমেই উৎকৃষ্ট বলা যায় না। কানন দেবী আর সুচিত্রা সেন-এর অভিনয় রীতি সম্পূর্ণ আলাদা, কেউ কারুর থেকে কম ভালো অভিনেত্রী একথা বলা যায় না। তবু যে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধরা হা-হুতাশ করেন, যেমন তাঁরা বলেন সেকালে যেরকম ভালো ভালো খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত, একালে তেমন কিছুই পাওয়া যায় না—সেকালের সাহিত্য এখনকার চেয়ে কত উন্নত ছিল ইত্যাদি—এসবই হচ্ছে যৌবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস। যৌবনে অনেক কিছুই ভালো লাগার জন্য মন প্রস্তুত থাকে। জীবন সায়াহ্নে খুবই উপভোগ্য হয় সেই যৌবন রোমন্থনের আমেজ। সমসাময়িক কিছু আর পছন্দ হয় না। বাংলা সিনেমার প্রথম যুগে—যখন এই শিল্পটি থেকে নতুনত্বের চমক বিচ্ছুরিত হচ্ছে—হয়তো আমাদের দেশের সর্বশ্রেণীর দর্শকদেরও এমন কি যৌবনকেও মুগ্ধ করতে পেরেছিল—এখন শুধু কৈশোর, অপরিণত মানুষ ও নিষ্কর্মাদেরই আকৃষ্ট করতে পারে।

বছর দশেক আগে কলকাতার শিক্ষিত নব্য যুবকদের মধ্যে একটা ফ্যাশন চালু হয়েছিল—ফিলম ক্লাবের সদস্য হয়ে ফরাসী, চেক, ইতালিয়ান ছবি এবং সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক ব্যতীত (মৃণাল সেন তখনও যথেষ্ট প্রগতিশীল হননি) অন্য কোনো পরিচালকের বাংলা ছবি না দেখা। আমিও সেই ফ্যাশনের বশবর্তী হয়েছিলুম। প্রথম প্রথম ফিলম ক্লাব প্রদর্শিত যে কোনো ফিলমকেই উচ্চাঙ্গের বলে স্বীকার করতে বাধ্য হতুম, যে ফিলমের মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি সেটিকেও বাহবা দিয়েছি। ফ্যাশনের নিয়মই এই। আস্তে আস্তে ব্যক্তিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে মতামত জানাতে আর ভয় পাই না যে

ফিলম সোসাইটিতে দেখা অধিকাংশ ছবিই মোটামুটি যেমন তেমন, কিছু ছবি বেশ খারাপ। দুর্বোধ্য ছবি মানেই বাজে ছবি।

ফিলম যে সাহিত্য বা চিত্রশিল্প নিরপেক্ষ আলাদা একটি শিল্প —এই মতবাদ এক সময় প্রবল হয়ে ওঠে। ঠিক আছে, আলাদা শিল্প হিসেবে মেনে নিতে কারুর কোনোই আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু সেই আলাদা শিল্পের চেহারাটা কি? সে সম্পর্কে এই মতবাদ পোষণকারীরা কখনই স্পষ্ট হতে পারেন নি। যখনই কারুর বিশ্বাস বা চিন্তা স্পষ্ট হয় না—তখনই কতকগুলি দুর্বোধ্য জগাখিচুড়ি বস্তু তৈরী হয়, সাহিত্যেও নতুন আন্দোলনের নামে এই ব্যাপার বার বার দেখা গেছে। যাই হোক, ফিলমকে আলাদা শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথম কোপই আসে কাহিনীর ওপর। সাহিত্য থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টায় আধুনিক ফিলম কাহিনীকে বাদ দিতে চায়।

যেমন, আধুনিক চিত্রশিল্পও কাহিনী বিবর্জিত হতে চেয়েছিল। কোনো শিল্পী যখন কোনো নারী-পুরুষ বা প্রকৃতির দৃশ্য আঁকেন, তখনই তার মধ্যে একটা কাহিনীর আভাস আসে—সেই নারী বা পুরুষটি কি করছে বা ঐ প্রকৃতির দৃশ্য কেন—এই প্রশ্ন। আমরা যখন মোনালিসার ঠোঁটের হাসিটির প্রশংসা করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা ঐ চিত্রটির শিল্পীকে কোনো শিরোপা দিই না—আমরা মুগ্ধ হই 'কটি হাস্যময় নারীর মুখচ্ছবির গল্পে, শিল্পী সেটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন মাত্র। সুতরাং আধুনিক চিত্রশিল্পে সব রকম হুবহু প্রতিকৃতি বাদ গেল, শুধু রেখা ও রঙের সমাহার। থিয়োরি হিসেবে এটা ঠিক, কিন্তু নিরবয়ব রেখা ও রঙের সমাহারের ছবি দ্রুত দূরে সরে যেতে লাগলো উপভোক্তাদের কাছ থেকে। শুরু হলো দুর্বোধ্য ছবির যুগ—চিত্র প্রদর্শনীতে কোনো ছবি উল্টো বা সোজা করে টাঙানো হয়েছে কিনা বোঝা যায় না—কিছু লোক কিছুই না বুঝে আহা উহু করে, অনেকে সোজাসুজি নাক কুঁচকোয়। মুষ্টিমেয় বড়লোকের বা বিদেশী দূতাবাস কর্মীদের

অনুকম্পায় বৈঠকখানা শোভিত হওয়া ছাড়া আধুনিক চিত্রশিল্পের আর কোনো মূল্য থাকছিল না। এখন অনেক আধুনিক চিত্রশিল্পী আবার অবয়বে ফিরে আসছেন।

আধুনিক ফিলম আন্দোলনের নামে ফরাসী দেশে পটাপট কিছু ফিলম তৈরী হতে লাগলো—যাতে গায়ের জোরে কাহিনীকে অস্বীকার করার চিহ্ন স্পষ্ট। গদার বা অ্যাঁলা রেজে জাতীয় পরিচালকের নামডাকে গগন ফাটার উপক্রম। বস্তুত ওঁরা কতকগুলো সাময়িকভাবে চাঞ্চল্যকর ছবি তুলেছেন, বা মাথার মধ্যে খানিকটা সুড়সুড়ি দিলেও মনে দাগ কাটে না। আমাদের দেশে ওদের নিয়ে এক সময় পত্র পত্রিকায় খুব উৎসাহ প্রকাশ করা হয়েছিল, তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ঐ ধরনের ছবি তুলে কেউ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেননি। দর্শকরা ছবিঘরে বসে পর্দায় মানুষের মুখ ও হাঁটা চলা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথা শুনতে (যার মধ্যে নাকি চিন্তার খোরাক আছে) মোটেই রাজি হলো না। সেই সব পরিচালকরা আবার কাহিনীতে ফিরে এসেছেন। কাহিনী বাদ দিয়ে সিনেমাকে আলাদা শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা গেল না।

পৃথিবীর সত্যিকারের বড় পরিচালকরা অবশ্য কখনো কাহিনীকে দেন নি। প্লট সম্পর্কে ধারণা বদলেছে ঠিকই, যেমন আধুনিক াহিত্যে। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ছাড়া রও কয়েকজনের ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়, বিদেশ ণের সূত্রে। দৈবাৎ ইওরোপের একটি শহরে এক পক্ষকালীন দর্শনীতে ইনগমার বার্গমানের (এই নামের আরও তিনরকম চারণ আছে) সব কটি ছবি দেখার সুযোগ জুটে যায়। এই াচ্চিত্রের দার্শনিকটি প্রথম আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ যে সাহিত্য বা মঞ্চ নাটকের চেয়ে চলচ্চিত্রের খানিকটা মালাদা ও গভীর আবেদন আছে। 'সেভেনথ সীল' বা 'সাইলেন্স' ছবি বহুদিন মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। একই সঙ্গে তুলনা করা চলে জাপানী পরিচালক কুরোসোয়া'র। 'রসোমন' থেকে

'রেড বিয়ার্ড' পর্যন্ত ছবিগুলির কি অসাধারণ ব্যাপ্তি। 'রেড বিয়ার্ড' দেখতে দেখতে মনে হয় একটি আধুনিক মহাকাব্যকে প্রত্যক্ষ করছি। যেমন, পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'রসোমন' ছবিটির নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। একটি মানবিক কাহিনীকে কত নতুনভাবে বলা যায়, তিনি দেখিয়েছেন। বহুকাল আগে তোলা অরসন ওয়েলস-এর 'সিটিজেন কেন'ও এইরকম একটি দৃষ্টান্ত। বুনুয়েল-এর 'ল্যাস অলভিদাদস' ফিলমে দেখেছিলাম সাহিত্য ও চিত্রশিল্পের আঙ্গিক মিশিয়ে একটি সামাজিক বক্তব্য কত তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। ফেলিনির ছবিও সাহিত্য রসাশ্রিত 'সাড়ে আট' ছবিটি খুব গভীরভাবে সাহিত্য রসই পৌঁছে দেয়—যদিও আঙ্গিকটি এমন যা ফিলমের পক্ষেই সম্ভব, ভাষার পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলা যায়।

এইসব ছবি দেখার পর মনে হয়, আমাদের দেশে এইসব ছবির অবাধ প্রদর্শনের ব্যবস্থা কেন করা হয় না। তাহলে সাধারণ ইঙ্গ-মার্কিনী ছবিগুলি দেখার রুচি আর হতো না। কিন্তু একথাও অবশ্য মনে রাখা উচিত, সত্যজিৎ রায়ের মতনই ঐ সব পরিচালকও তাঁদের যাঁর যাঁর দেশে দু'একজনই মাত্র। অনেক ইটালিয়ান ও ফরাসী ছবি আমি দেখেছি—যা প্রায় হিন্দী সিনেমার মতনই। যে কোনো উচ্চাঙ্গের শিল্পের মতনই ভালো ফিলম সব দেশেই নামমাত্র।

লেনিন চলচ্চিত্রের ভূমিকার ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের ফিলমের সঠিক স্থান এখনো বোঝা গেল না। ওইসব দেশের ফিলম না হতে পারলে শিল্প, না হতে পারলো প্রচারের উৎকৃষ্ট বাহন। প্রচার হোক আর যাই হোক, উৎকৃষ্ট রস যদি পরিবেশন করতে না পারা যায় তাহলে যে দর্শক দেখবে না। জোর করে তো ফিলম দেখানো বা বই পড়ানো যায় না। পোলাণ্ডের বেশ কয়েকটি ভালো ছবি আমরা দেখেছি, চেকোশ্লোভাকিয়ার দু'একটি বাদ, বাকি রাশিয়া সমেত অন্যান্য

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ফিলম অত্যন্ত মোটা দাগের। রাশিয়ার তোলা ব্যালের ডকুমেণ্টারি ধরনের ছবিগুলি ছাড়া অন্য কোনো ফিলম দেখতে আগ্রহ বোধ হয় না। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের একটিও ফিলম এ পর্যন্ত দেখার সুযোগ পাইনি—ও দেশের ফিলম সম্পর্কে কোনো খবরাখবরও চোখে পড়েনি। সুতরাং কিছুই জানি না।

ফ্যাশানের বশবর্তী হয়ে বেশ কয়েক বছর ফিলম ক্লাবের বিদেশী ছবি দেখতাম ও সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক ছাড়া অন্য বাংলা বই দেখতাম না। হঠাৎ একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা অন্তে ঠিক করলাম, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ যেসব ছবি দেখে ও আনন্দ পায় সে সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। তখন 'মণিহার' নামে একটি ছবি বেশ জনপ্রিয়—ঝপ করে ঢুকে গেলুম সেটা দেখতে। শেষ পর্যন্ত দেখেছি, উঠে আসিনি। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, যাঁরা এই ছবিটি তোলার উদ্যোগ আয়োজন করেছেন, পরিচালনা বা চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব যাঁদের ওপর—তাঁরা কি সত্যই তত মূর্খ যতটা মনে হয় এই ছবি দেখে? তা হতেই পারে না। এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড মুর্খ লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে তাঁরা অনেক বেশী বুদ্ধিমান, তাঁরা খুব দক্ষভাবে হিসেব করে দেখেছেন, সাধারণ দর্শকরা কি কি দেখতে ভালবাসেন। একটি ছবির মধ্যে তার সবগুলিই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি ছবি দেখে বিচার করা উচিত নয় বলে দেখতে গেলাম আর একটি ছবি, 'বালিকা বধূ'। প্রখ্যাত লেখকের গল্প, সুতরাং মনে মনে একটু ভরসা ছিল—কিন্তু দেখতে গিয়ে পেলাম অতিরিক্ত অনেকখানি। খুবই সাবলীল স্বচ্ছ, কৌতুকময় ছবি—জনরুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়েছে কিন্তু উদ্ভট আজগুবি কিছু ঢোকানো হয়নি—আমাদের দেশের পক্ষে এই ধরনের ছবি যথেষ্টেরও বেশী ভালো। কিন্তু বাংলা ছবির মান এখানেই বাঁধা থাকে না—আবার মাঝে মাঝেই যে অনেক নিচে নমে যায়।

হিন্দী ছবি সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। ইহ জীবনে আমি তিনটি মাত্র হিন্দী ছবি দেখেছি—তার মধ্যে তুটির নাম 'ডক্টর কোটনিস কি অমর কহানী'—স্কুল থেকে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেখতে গিয়েছিলাম। এবং দ্বিতীয়টি, 'বৈজু বাওরা'—ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেব ঐ ছবিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, এইজন্য দেখতে যাওয়া। তৃতীয় ছবিটি দেখি অনেক পরে। নারগিস, রাজকাপুর, দেবানন্দ, হেমামালিনী প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ব্যক্তিদের আমি দেওয়ালের পোস্টারে ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। তাতে খুব যে ক্ষতি হয়েছে জীবনের, তা মনে হয় না—জীবনে কত ভালো ভালো জিনিসই তো দেখা হয়নি। তৃতীয় হিন্দী ছবিটি দেখতে যাই ঐ একই কারণে, হিন্দী ফিলম ব্যাপারটা কি জানার জন্য। হাতের কাছেই তখন চলছিল 'ছোটিসি মুলাকাৎ'। এটাও শেষ পর্যন্তই দেখেছি—একবারও সিগারেট খেতে বাইরে যাইনি—তবে মাঝ মাঝে ছবির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম কাছাকাছি দর্শক-দর্শিকাদের মুখের ভাব। মনে হলো সবাই বেশ পছন্দ করছে। এরকম একটা দানবিক কাহিনী যে পনেরো ষোল হাজার ফুট ধরে কেউ দেখাবার কথা চিন্তা করতে পারে—একথা আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। যেরকম ফর্মুলা বাঁধা গল্প, তাতে মনে হয় অধিকাংশ হিন্দী ফিলমের অনুকরণেই এটি রচিত। যাক খুব শিক্ষা হয়ে গেল। বুঝলাম, ভারতবর্ষে এখন কি ব্যাপার চলছে!

হিন্দী ছবি না দেখলেও হিন্দী সিনেমার গান এড়াবার উপায় নেই। নির্জন পাহাড়ে গেলেও হিন্দী সিনেমার গান তাড়া করবেই। প্রথম দিকে বিরূপতা ছিল, পরে মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝলাম, হিন্দী ছবির গান খুব অপকৃষ্ট নয়। বাংলা সিনেমার গান বা আধুনিক গানের চেয়ে অনেক ভালো এবং জোরালো। বিদেশী সুর মেশানো থাকলেও অধিকাংশ হিন্দী গানের মূল ভিত্তি বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সঙ্গীতের ওপর—বাংলা ফিলম এ ভূমিকা

নিতে পারে নি। তবু আমাদের দেশের সর্বত্র যে এই হিন্দী গান ঢুকে পড়ছে তার জন্য অস্বস্তি হয়—ঐ গানের জন্য নয়, ঐ সব গান হিন্দী সিনেমার যে কালচারের প্রতিনিধিত্ব করে তার জন্য।

কিন্তু অধিকাংশ দর্শক যদি ঐ 'ছোটিসি মুলাকাৎ' বা 'মণিহার' ধরনের ছবি দেখতে চায়, তাহলে উপায় কি? ফিলম তোলা বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার—শিল্পের নামে তো কেউ উৎসর্গ করতে পারে না। একবার পারলেও বারবার পারে না। আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন পরিচালক সত্যিকারের ভালো ছবি তোলার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু একটির বেশী দুটি ছবি তাঁরা তৈরী করার সুযোগ পাননি, পেলেও পরবর্তী ছবি অবধারিতভাবে কমার্শিয়াল। একই লোকের পক্ষে দু'রকম ছবি তোলা একটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। ঋত্বিক ঘটক এরকম চেষ্টা করেছেন এবং বেশী ডুবেছেন। ফলে উন্নত মানের ছবি তুলতে অনেকেই এখন ভয় পান বা প্রয়োজনের অভাবে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। ফিলম ফিনান্স করপোরেশন এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই নিতে পারেনি শুনেছি। একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের কথা আলাদা। অনেক দুঃখ কষ্ট বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে তিনি এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছেন, যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়।

এতক্ষণ এই লেখার মধ্যে 'আমি'র অংশ একটু বেশী হয়ে গেছে। আমি কি দেখেছি বা আমি কি মনে করি—এটা একটা বলার মতন ঘটনা নয়। আসলে আমি বোঝাতে চাইছিলাম, পশ্চিম বাংলায় আমার মতন যে কোনো একজন মানুষ, মোটামুটি শিক্ষিত বলা যায়, বাইরের কিছু খবরাখবর যে রাখে, ফিলম জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, ফিলম সোসাইটি আন্দোলনেরও ভূমিকা নেই—অথচ ভালো ফিলম দেখলে খুশী হয়, এমন একজনের বাংলা ছবি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া কি? জনরঞ্জন ও শিল্পরুচি নিয়ে বাংলা ছবির যে দ্বন্দ্ব আছে তার কোনো সমাধান আমার জানা নাই।

॥ ১৬ ॥

বনগাঁ লোকালের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। দরজার কাছাকাছিই জানলার পাশে বসে আছে ঐ দুজন লোক, দুজনেরই হাতে হাত-কড়া, তাছাড়াও কোমরে দড়ি বাঁধা—দড়িটির এক প্রান্ত ধরে আছে দুজন পুলিশ।

লোক দুজনেরই পরনে টেরিলিনের সার্ট, যদিও ময়লা খুবই, এবং ধুতি। গালে সপ্তাহ দু-একের দাড়ি একজনের হাতে বেশ একটা দামি ঘড়ি যদিও কাঁচটা ফাটা।

সচরাচর এমন বিচিত্র যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দেখা যায় না। সবাই কৌতূহল গোপন না-করা চোখে দেখছে, ওদিকের কোণ থেকে একটি বাচ্চা ছেলে, আমি দেখবো আমি দেখবো বলে সীটের উপর উঠে দাঁড়ালো।

লোক দুটির একেবারে মুখোমুখি যে সীট, সেটাতে বসে থাকা যাত্রীদের আর কোন কাজ নেই, তারা প্যাট প্যাট করে দেখছে ওদের। প্রত্যেকদিন ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়—জানলার বাইরের মাঠ-ঘাট জঙ্গলের দৃশ্য একঘেয়ে হয়ে গেছে, ফেরিওলাদের বয়ানও মুখস্থ, 'নূতন' বলতে শুধু এই হাত-কড়া দিয়ে বাঁধা লোক দুটি।

বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারলো না, একজন জিজ্ঞেস করলো আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

বন্দী দুজনের একজনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হরিদাসপুর।

—ও হরিদাসপুর ? আপনাদের কি পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—আপনারা কি পাকস্তানী ?

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। পাকিস্তানী চর? ছত্রী বাহিনী? কিন্তু সে-সব হুজুগ অনেকদিন কেটে গেছে। লোক দুটির চেহারা দেখেও এমন কিছু ভয়ংকর মনে হয় না। নিরীহ, কামরার আর পাঁচজনের মতনই।

একটু বাদে আবার আর একজনের প্রশ্ন: আপনারা ইনডিয়ায় এসেছিলেন কেন?

একজন কনস্টেবল বললো, বাবুজী, ইন লোগকা সাথ বাতচিৎ মাৎ কিজিয়ে!

পুলিশকে আজকাল আর কে গ্রাহ্য করে! বাবুজীটি তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি থামো তো! কথা বললে কি ক্ষয়ে যাবে নাকি! তোমাদের কেরদানি তো সব জানা আছে! হ্যাঁ, আপনারা ইনডিয়ায় এসেছিলেন কেন?

বন্দী দুজনের একজন দীর্ঘশ্বাস ফেললো, ম্লান গলায় বললো: হিন্দুস্থানে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে। অনেকদিন দেখা হয় না—তাই দেখা করতে এসেছিলাম। দেখাও হলো না—

—আপনারা পাসপোরট নিয়ে আসেননি?

—পাসপোরট ছিল, কিন্তু ভিসা পাইনি—ছ-মাস ঘুরেও ভিসা পাইনি।

এরপর আর কথা বলার বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন শুধু শূন্যে খেদোক্তি করলো, ঝগড়া হচ্ছে দিল্লি রাওয়ালপিনডির সঙ্গে—, আর বাংলা দেশের পিণ্ডি চটকাচ্ছে! আমারও আপন মেজোশালা রয়েছে খুলনায়—কতদিন তাকে দেখি না!

আর একজন লোক আবার জিজ্ঞেস করলো, পাকিস্তানে কোথায় বাড়ি আপনাদের?

—খুলনায়। মীরপুর গ্রামে—

—মীরপুর? ওর কাছেই তো আমাদের কাপাসডাঙ্গা! চেনেন কাপাসডাঙ্গা!

—হ্যাঁ চিনি।

কামরার সবাই কান খাড়া করে এই আলোচনা শুনেছিল। ভেতর দিক থেকে একজন বৃদ্ধা বিধবা মহিলা একেবারে হন্তদন্ত হয়ে উঠে এলেন এখানে। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কি বললে বাবা? মীরপুর? খুলনার মীরপুর? তোমরা মীরপুরের লোক?

—হ্যাঁ, মা। আমরা দুজনেই মীরপুরে থাকি।

—ঐ মীরপুরেই তো ছিল আমার শ্বশুরবাড়ি! মীরপুরের ঘোষালদের বাড়ি চেন না? কি ধূমধাম করে দুর্গোৎসব হতো সেখানে।

—হ্যাঁ, মা চিনি ঘোষালবাড়ি। ঐ তো ইয়ে, আপনার বড় বট গাছটার পাশে—

—আমি মীরপুরের সবাইকে চিনতাম। আমি যখন দেশ ছেড়েছি, তখন তোমরা খুব ছোট ছিলে। মৌলবী সাহেব এখনো বেঁচে আছেন? দৌলত হোসেন!

—না, উনি মারা গেছেন।

—তোমরা মীরপুরের লোক! কতদিন শ্বশুরবাড়ির লোক দেখিনি। তোমাদের দেখে যা আনন্দ হচ্ছে না! তোমাদের এরকম হাত-কড়া পরিয়েছে কেন পোড়ার-মুখোরা!

—আমার দিদি থাকেন খিদিরপুরে, আর এর আপন চাচা থাকেন মেটিয়া বুরুজে, তাই দেখা করতে এসেছিলাম। দেখাও হলো না; পুলিশে ধরলো।

—আপন লোকের সঙ্গে মানুষ দেখা করবে না! আমার দ্যাওর রয়েছে এখনও চিতলডাঙ্গায়—

তারপর কামরার মধ্যে প্রশ্নের ঝড় বইতে লাগলো। পাকিস্তানে চালের দাম এখন কত? মাছ দুধ এখনও কি সস্তা? মীরপুরের সাঁকোটা কি এখন পাকা হয়েছে? কাপাসডাঙ্গায় এখনও দুর্গাপুজোয় মোষ বলি হয়? খুলনা টাউনে নাকি মেয়েদের কলেজ হয়েছে? পাকিস্তানের ট্রেনে কি এরকম ভিড় হয়?

অনেকে উঠে এসে বন্দী দুজনের গা ঘেঁষে বসেছে। কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তার সুর। অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক বাষ্প চাপা রইলো।

আমি একপাশে বসে বসে শুনছিলাম, আমার স্টেশন এসে গেছে, উঠে দাঁড়ালাম। একজন কনসটেবল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে আর ফিক ফিক করে হাসছে আপন মনে। হাসিটা দেখে আমার কি রকম সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলাম, কি সিপাহীজী হাসছো কেন?

লোকটি এক গাল হেসে হিন্দীতে যা বললো, তার অর্থ এই ঐ বদমাস দুটো কি গুল ঝাড়ছে! ওরা পাকা স্মাগলার, এই নিয়ে তিনবার ধরা পড়লো। অথচ কি রকম নিরীহ সেজে গল্প জমিয়েছে? দেবো নাকি সবাইকে সত্যি কথাটা বলে?

আমি ফিসফিস করে বললাম—না, দরকার নেই সত্যি কথাটা বলে। সবাই কিছুক্ষণের জন্য পুরোনো দিনের কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছে—কি দরকার সেটা ভেঙে। তাছাড়া দেশ ভাগ না হলে তো আর আমরা ওদের স্মাগলার বলতুম না।

॥ ১৭ ॥

কলেজ ষ্ট্রীট কফি হাউসের সামনে প্রায়ই একটি মুসলমান মেয়ে আমার কাছে ভিক্ষে চাইতো। অবশ্য ভিখারির আবার হিন্দু মুসলমান কি? ভিখারির জাত হচ্ছে ভিখারিই।

তবু, মেয়েটির মুখখানা ভারি সুশ্রী, টলটলে হরিণ চোখ, আর কথাবার্তায় সারল্যের সুর দেখে আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই খুকী, তোর নাম কি রে?

মেয়েটির বয়েস হবে আট ন' বছর, মাজা মাজা গায়ের রং, আগেকারদিনের বিখ্যাত অভিনেত্রী নারগিসের সঙ্গে ওর মুখের যেন

একটা মিল আছে কোথায়। ভালো করে সাবান মাখিয়ে স্নান করালে এবং পরিষ্কার ফ্রক পরিয়ে দিলে ওকে নারগিসের মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

নাম জিজ্ঞেস করায় মেয়েটি লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়লো। ভিখারিদের তো নাম জিজ্ঞেস করার নিয়ম নেই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, তোর নাম কি বল্ না?

ঘাড় গুঁজে বিড়বিড় করে কি যেন বললো, আমি বুঝতেই পারলাম না।

এবার ওর থুতনি ধরে উঁচু করে আবার ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েটি বললো, আইসা।

আমি বললাম, আইসা। আইসা আবার কি নাম? ঠিক করে বল্।

আমার সঙ্গে দু'তিনজন বন্ধু ছিল। তাদের মধ্য থেকে সামসের বললো, আইসা মুসলমান মেয়েদের নাম হয়।

যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, কিরে, তোরা মুসলমান?

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ।

সামসের আমাকে বললো, অবাক হচ্ছো কেন? মুসলমান ভিখিরি দেখো নি কখনো আগে?

আমি বললাম, কি জানি। ভিখিরিদের জাতের কথা আগে ভেবে দেখি নি।

সামসেরদের দুটো কয়লা খনি আছে রাণীগঞ্জে। মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে। কিন্তু ভিক্ষে দেওয়ার খুব বিরুদ্ধে। ওর বক্তব্য হচ্ছে, ভিক্ষে দেওয়া মানেই সমাজে নতুন ভিখিরির সৃষ্টি করা। ভিক্ষে দেওয়া বন্ধ করলে তবেই এরা কাজ করতে বাধ্য হবে।

আমি অতশত চিন্তা করি না। মেয়েটিকে দশটা পয়সা দিয়ে কফি হাউসে উঠে গেলাম।

তারপর থেকে মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রায় দেখা হয়। কফি হাউসে ঢোকার সময় কিংবা বেরুলেই কোথা থেকে ছুটে আসে,

হাত ধরে বলে, ও বাবু, দাও, পাঁচ নয়া দাও, তিনদিন আসো নি !

ভিখারি দেখলে আমার দয়া উথলে পড়ে তা নয়। আমি সমাজ সংস্কারকও নই। ওদের পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কখনো দিই কখনও দিই না। সেটা আমার মেজাজের উপর নির্ভর করে। এই মেয়েটিকে দেখলেই আমার মনের মধ্যে এক ধরণের সজল ভাব আসে বলে (আমি নারগিসের খুব ভক্ত ছিলাম কিনা !) ওকে পাঁচ দশ পয়সা দিই। পাঁচ পয়সার কম দিলেও নেয় না। ও যেন ভিক্ষে চায় না। দাবি করে।

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলুম, এই, তুই রাত্তিরবেলা থাকিস কোথায় ?

আইসা হাত দিয়ে হ্যারিসন রোডের ওপর একটা বিরাট বাড়ি দেখিয়ে দিল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ঐ বাড়ির গাড়িবারান্দার তলায় ওদের মতো অনেকেই থাকে।

—তোদের কোন বাড়ি নেই ? তোর বাবা মা নেই ?

—আছে।

—কোথায় ?

—বাবা বসিরহাটে। মা এখানে। মা-টার সঙ্গেই তো আমি থাকি।

—বাবা কি করে ?

—চাষ করে।

—তা হলে বাবার সঙ্গেই থাকিস না কেন ?

ও কোন উত্তর না দিয়ে ঠোঁট দিয়ে একটা ভঙ্গি করলো। মেয়েটা কখনো দুঃখ দুঃখ ভাব করে না। বেশ হাসিখুসী থাকে।

টুকিটাকি প্রশ্ন করে ওর মোটামুটি পরিচয়টা জেনে নিলাম। ওর বাবা একজন চাষী। দুটি বিয়ে, সব সমেত পনেরোটি সন্তান। আইসার মায়ের দুর্ভাগ্য এই যে তার শুধু সাতটা মেয়েই হয়েছে, ছেলে হয় নি। বোঝা যায়, পরিবার পরিকল্পনার ডঙ্কা নিনাদ বসিরহাটে ঐ চাষী পরিবারের কানে পৌঁছায় নি।

যাই হোক, অতগুলো মেয়ে নিয়ে আইসা'র বাবা করবে কি! চাষের কাজেও লাগে না। শুধু বসে বসে খাওয়ানো। তাই মেয়েগুলি সমেত আইসার মাকে ওর বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে।

এক মেয়ের কোন ক্রমে বিয়ে হয়েছিল। আর এক মেয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। বাকি পাঁচ মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। ওর মা ছুটকো ছাটকা কাজ করে। রাজ মিস্ত্রিদের কাছে ঠিকে কাজ পায় কখনো কখনো। আইসা'র পরেও আরও ছোট তিন বোন আছে।

গোলদিঘির কাছে দাঁড়ানো একটি বারো তের বছরের মেয়েকে দেখিয়ে আইসা বললো, ঐ যে আমার দিদি।

সে বেশ চতুর ভাবে ভিক্ষে করতে শিখেছে। ঘ্যানঘ্যানানির সুরটা রপ্ত করে নিয়েছে ভালো ভাবে।

আইসাকে জিজ্ঞেস করলাম, সারা দিনে কত পাস রে?

—আট আনা! ষাট পয়সা!

তাতেই আইসাকে বেশ খুশী মনে হলো। কে যেন বলেছিল, কলকাতায় ভিখিরিদের অনেক রোজগার?

যে বিরাট বাড়ির গাড়ি বারান্দার তলায় ওরা শোয়—সে বাড়িতে কখনো বিয়ে শাদী কিম্বা কোন উৎসব হলে সেদিন আস্তাকুঁড় ঘেঁটে ওরাও ভালো ভালো খাবার পায়।

আইসার কাহিনী শুনে আমি দুঃখে অভিভূত হয়ে যাই নি। নিস্ফল দুঃখ নিছক বিলাসিতা মাত্র। আমি নিজে যদিও ফর্সা জামা কাপড় পরি, এবং রাস্তায় হাত পেতে ভিক্ষে করি না—তবু জীবনের নানা স্তরে আমিও ভিখারী। ইচ্ছে মতন বেঁচে থাকার স্বাধীনতা আমারও নেই।

কলকাতায় সাধারণত এক ভিখিরিরা এক জায়গায় বেশী দিন থাকে না। ওদেরও আমি দেখেছিলাম দু'তিন বছর মাত্র। তারপর সামসের চলে যায় আমেরিকায়, রতন চলে গেল দিল্লীতে চাকরি নিয়ে—কফি হাউসে আমাদের আড্ডাও গেল ভেঙ্গে।

এই দু'তিন বছরে আমি আইসার খুব একটা পরিবর্তন দেখিনি। তবে, এর মধ্যে দেশের অবস্থা যে আরও খারাপ হয়েছে, তার ছাপ পড়েছে ওর চেহারায়। মুদ্রা মূল্য কমে গেলেও তো দেশে ভিখিরিদের রেট বাড়ে না। কেরানী বা শ্রমিকদের মতন তারা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বাড়ানোর জন্য মিছিলও করতে পারে না।

আইসা এই দু' বছরে আর একটু রোগা হয়েছে। মুখের সেই সজীব টলটলে ভাবটা আর নেই, নভেম্বরের শীতেও একটা ছেঁড়া গেঞ্জি ও ইজের পরে আছে।

কিন্তু ওর সারল্যটুকু নষ্ট হয় নি। এখনো ছুটে এসে হাত ধরে বলে, ও বাবু, দাও দশ নয়া। তুমি অনেক দিন আসো নি। আসো না কেন ?

যেন ওর জন্যই আমার কফি হাউসে আসা উচিত। আমি একটু হেসে চুপ করে থাকি।

গোলদিঘির রেলিং এর পাশে যে মেয়েটিকে দেখিয়ে আইসা বলেছিল, ঐ যে আমার দিদি, তার অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দু'বছর আগে তাকে দেখেছিলাম একটা ছেঁড়া ফ্রক পরে থাকতে, এখন সে মোটামুটি একটা অটুট শাড়ী পরে আছে। সেই ঘ্যানঘ্যানানির সুর আর নেই, তার বদলে নীরবে হাত পেতে ভিক্ষে করছে। দেখে মনে হয় যেন শীগগিরই বাচ্চা-কাচ্চা হবে।

হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল। এই ভিখিরিগুলো একেবারে রক্ত বীজের ঝাড়। খেতে পায় না, পরতে পায় না, তারপর জড়িয়ে পড়েছে। আবার একটা ভিখিরির জন্ম দেবে। কলকাতার রাস্তা এই করে যে ভরিয়ে দেবে একেবারে।

ওর দিদির ওপর রাগ করে সেদিন আমি আইসাকেও ভিক্ষে দিলুম না।

এরপর কিছুদিন আমাকেও কলকাতার বাইরে যেতে হলো। ফিরে আসবার পর কফি হাউসে যাওয়া অনিয়মিত হয়ে গেল খুবই, আইসাকেও আর দেখতে পাই না। ভুলেও গেলাম ওর কথা।

এর পাঁচ বছর পরের কথা। আমি আর রতন এক সন্ধ্যেবেলা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গল্প করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। ন'টার সময় ফিরছিলাম মাঠের মধ্য দিয়ে, কেল্লার পাশ দিয়ে।

হঠাৎ দেখলাম, একটা কনস্টেবল তিনটি মেয়েকে তাড়া করছে লাঠি হাতে। এ দৃশ্যে কৌতূহল জাগ্রত হবেই। মেয়ে তিনটি ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে।

আমি পুলিশটিকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেয়া হোতা হ্যায় ?

রতন আমার হাত ধরে টেনে নিলো, কেন ঝামেলায় জড়াচ্ছিস ?

আমি বললাম, চুপ কর না।

পুলিশকে ভয় না-পাবার একটাই কারণ থাকতে পারে—যদি চেনাশুনা থাকে পুলিশের কোনো হোমরা-চোমরার সঙ্গে। একজন ডি. সি. আমার বন্ধু।

সেপাইটি বললো, বদমাস হ্যায়! বদমাস!

আমি ধমক দিয়ে বললাম, বদমাস হ্যায় বলেই কি তোমাকে ঘুষ দিতে হবে নাকি ?

সেপাইটি চোখ গরম করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, লালবাজারে অরুণ রায়কে টেলিফোন করবো ?

একথা শুনেই সেপাইটি দাঁড়ালো না। হনহন করে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মেয়ে তিনটি আমাদের কাছেই দাঁড়িয়ে। কৃতজ্ঞতাসূচক একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওদের মধ্যে একজনকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। ঠিক নারগিসের মতন মুখ না ? সন্দেহ কি, এই মেয়েটি সেই আইসা।

ও আমাকে চিনতে পারে নি। আমার মুখ তো কোনো বিখ্যাত চিত্রাভিনেতার মতন নয়, কেউ বেশীদিন মনে রাখতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি ?

—গোলাপ।

—বাঃ, আইসা'র থেকে গোলাপ নামটা তো ভালোই! মেয়েটি লজ্জা কিংবা ভয় পেল। আমি কিন্তু বেশ খুশীই হয়েছি ওকে দেখে। আর যাই হোক, বেঁচে তো আছে! একটা ঝলমলে শাড়ী পরেছে, স্বাস্থ্যও মন্দ না। যে-কদিন বয়েস আছে, যদি একটু ভালো করে খেতে পরতে পায়, তাহলে আমি ওকে ঘৃণা করবো কোন অধিকারে ?

এটা, একরকমের ভিক্ষে, তবে, একসঙ্গে দু'পাঁচ টাকা পায়, বিনিময়ে কিছু দেয়। মেয়েটা বাঁচে বাঁচুক।

আইসার পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি।

মেয়েটি নতমুখে বললো, বীণা চক্রবর্তী।

তৃতীয় মেয়েটিকে আমি আর নাম জিজ্ঞেস করলাম না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে ভিখিরিদের মতন এই মেয়েদেরও জাত থাকে না।

বললাম, ঠিক আছে, যাও। পুলিশকে কক্ষনো পয়সা দিও না। এত কষ্টের পয়সা!

১৮

ছেলেবেলা থেকেই সব কিছু অবিশ্বাস করতে শিখেছিলাম। দ্বিজেন জ্যাঠামশাইর বাড়ির বারান্দায় লণ্ঠন জেলে আমরা কয়েক-জন গল্প শুনতুম ওঁর কাছে। হঠাৎ বাইরে কি রকম অস্বাভাবিক শব্দ হতে আমরা সবাই ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে জ্যাঠামশাইর সামনে এসে বসতাম। দ্বিজেন জ্যাঠা গম্ভীর হয়ে বলতেন, যা দেখে আয় তো ওটা কিসের শব্দ! কে যাবে—আমাদের কারুর সাহস

নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই জোর করে একজন না একজনকে পাঠিয়ে দিতেন। হয়তো সেণ্টু ফিরে এসে মুখ চুন করে বলতো, কিছু তো দেখলুম না। জ্যাঠামশাই চোখ বুজে গড়গড়া টানতে টানতে বলতেন, সে কি আর এতক্ষণ থাকে।

—কে ? সে ? আমরা একেবারে শিউরে উঠতুম।

—কারণ ছাড়া কার্য হয় না। চোখে দেখতে না পেলেও কিসে কি হচ্ছে বুঝে নিতে হয়। আমাদের বাড়ির চাল থেকে তোদের বাড়ির রান্নাঘরের চালে লাফিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল মদনমোহন, পারেনি ঠিক মতো, ফস্‌কে গিয়ে অতিকষ্টে রান্নাঘরের চাঁদের দেয়ালটা ধরে ফর্‌ফর্‌ করে নেমেছে—আর দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ছিল রুটি সেঁকার চাটুটা—সেটা পড়ে গিয়ে ওরকম শব্দ হল।

মদনমোহন, জ্যাঠামশাইর আদরের হুলো বেড়ালটার নাম। ঘর থেকে এক পা-ও না বেরিয়ে ওরকম ছবির মতো ঘটনাটা কি করে বললেন—ভেবে আমরা অবাক হয়ে যেতুম। কিন্তু বিশ্বাস করতুম জ্যাঠামশাইকে। ঐরকমভাবেই আমরা ভূত-প্রেত অবিশ্বাস করতে শিখেছিলুম।

সন্ধ্যেবেলা এক-একদিন আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড়ে বেড়াতে যেতুম। ফেরার সময় ঘুটঘুটে অন্ধকারে আদিগন্ত পাট খেতের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দূরের একটা সাদা মতন পদার্থ দেখিয়ে জ্যাঠামশায় বলতেন, ঐ ছাখ পেত্নী দাঁড়িয়ে আছে। মাছ খেতে আসে রোজ।

জ্যাঠামশাই যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ওটা পেত্নী নয়। কারণ জ্যাঠামশাই বলেছেন যে, ভূত-পেত্নী বলে কিছু নেই। সুতরাং তাঁর কথার মর্যাদা রাখতেই আমরা তাঁর একথার প্রতিবাদ করতুম। তবে ওটা কি এখান থেকে বল তো ? তিনি জিজ্ঞেস করতেন। তখন আরম্ভ হতো আমাদের অনুমানের খেলা। কেউ বলতো কলাগাছ, কেউ বেলগাছ, কেউ বলতো—ওখানে একগোছা পাট শুকিয়ে ইন্দ্রপূজোর জন্য ধ্বজা করে গেছে। আমি বলেছিলুম :

ধোপাদের বউ ওখানে দাঁড়িয়ে হারানো গাধাটাকে খুঁজছে। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, আমারটাই ঠিক। আমরা আর কেউ মিলিয়ে দেখতে যাইনি। অন্য গল্প করতে করতে বাড়ি চলে গেছি।

এইভাবেই—যে কোনো কাজের পিছনে যুক্তি খোঁজার বদ অভ্যেস আমার দাঁড়িয়ে গেছে। এখন মনে হয়, সত্যিসত্যিই হয়তো অনেক ভূত-প্রেত অলৌকিক রহস্যকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনো একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পাবার আজকাল খুব ইচ্ছে হয়। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও খুব ভালো, কিন্তু ইচ্ছে হয় অকারণে চশমা-টশমা নিয়ে চোখ ভুটো একটু খারাপ করে ফেলি। তবু যদি কখনও কোনো সত্যিকারের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। এসব চেনা জিনিস দেখতে দেখতে একঘেয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি যুক্তি ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

মনে পড়ে, শ্যামপুকুরের বাড়িতে যখন থাকতুম নীচের তলাটা ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা, শুধু একটা ঘরে শুতুম আমি, বাড়ির আর সবাই দোতলায়। ঐ বাড়িতে ভুতের ভয় ছিল শুনেছি। আমাদের আগের ভাড়াটেদের বড় মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল ও বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে। কতজন তাকে দেখেছে। ছাদের ওপর চুল এলো করে বসে কাঁদতো—কেউ দেখতে পেলেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি কতবার চেষ্টা করেছি তার দেখা পাবার। একদিন মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ওপর টক্ টক্ আওয়াজ শুনলুম।

ঘুমের ঘোর কাটোর আগে শব্দটা কোথা থেকে আসছে কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার পাতলা ঘুম, চট্ করে ভেঙে যায়। বুঝতে পারলুম, শব্দ হচ্ছে আমার পায়ের কাছের জানলার পাল্লায়। অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি জানলার বাইরেটা—সেখানে কোনো মানুষের মুখ নেই। কিন্তু শব্দটা হাওয়ার নয়, স্পষ্টত মানুষের, নির্দিষ্টভাবে একটু থেমে শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

আমার বালিসের তলায় বেড স্যুইচ। তা ছাড়া ইঁদুরের উৎপাতের জন্য পাশে একটা মোটা বেতের লাঠি রেখে দিতাম। সুতরাং সশস্ত্র ছিলাম। তবু আলো জ্বালিনি, শুরু করেছি যুক্তির খেলা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমারই কোনো বন্ধু-বান্ধব ডাকতে এসেছে। দীপকের ফ্ল্যাটবাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে ও আমার সঙ্গে শুতো। কিন্তু দীপক তো চুপ করে থেকে জানলা নক্ করার ছেলে নয়। এতক্ষণে ওর কম্বুকণ্ঠে সারা পাড়া নিনাদিত হয়ে উঠতো। তবে কি কোনো চোর? আমি জেগে আছি কিনা দেখার জন্য আওয়াজ করছে? আমি খর চোখে তাকিয়ে রইলুম- জানলার পাল্লায় আবার আওয়াজ হল ঠক্ ঠক্ ঠক্। কিন্তু কোনো মানুষের হাত বা মুখ দেখা গেল না অথচ জানলাতেই যে শব্দটা করা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। জানলার কপাটদুটো ঘরের মধ্যে ঢোকানো—সুতরাং কেউ আওয়াজ করলে তার হাত দুটো আমি দেখতে পাবোই। এমন মূর্খ আমি—কোনো অদৃশ্য বা অলৌকিক অস্তিত্বের কথা তখন আমার মাথাতেই আসেনি। আমার পক্ষে সবচেয়ে সহজ ছিল—আলো জ্বেলে উঠে গিয়ে দেখা। কিন্তু ঐ যে—অনুমান এবং ডিডাকশান করার লোভ। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নানান্ যুক্তি ভাবতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম সমাধান। টিক্‌টিকিতে আরশোলা ধরেছে। আরশোলাটাকে মারার জন্য টিকটিকি অনেকবার ঝাপটা মারে। টিকটিকির যা স্বভাব—অসীম ধৈর্য নিয়ে থেমে ঝাপটা মারতে মারতে ওকে শেষ করবে। কাঠের জানলায় ঐ রকম আওয়াজ হচ্ছে ঝাপটা মারার। আমার এই সিদ্ধান্তে আমি এতদূর নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম যে, উঠে গিয়ে মিলিয়ে দেখারও ইচ্ছে হল না। ঘুমিয়ে পড়লুম পাশ ফিরে।

আজ সে জন্য কত অনুতাপ হয়। হয়তো টিক্‌টিকি নয়—সেই আত্মহত্যাকারিণী অষ্টাদশী মেয়েটি আসতে চেয়েছিল আমার ঘরে। দুটো কথা বলতে এসেছিল। আসবার আগে ভদ্রভাবে অনুমতি

চেয়েছিল। আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আজকাল ভূত আর ভগবান তো একই—অবিশ্বাসীর কাছে আসে না একেবারেই। ভয় দেখাতেও আসে না।

কিন্তু আমি যদি কোনো অলৌকিকের দেখা না পেয়ে থাকি—তবে 'অলৌকিক' নামে এ লেখাটা লিখছি কেন? না পেয়েছিলাম একবার। একটি অসম্ভব, অলৌকিক দৃশ্যের রাত্রি। চক্রধরপুর থেকে রাঁচী যাবার রাস্তায়, পাহাড়ের ওপর হেসাডি ডাকবাংলোয় একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম কয়েক বন্ধু। চারপাশে জঙ্গল—সন্ধ্যের পর ভাল্লুক আর চিতাবাঘের ভয় আছে—রাস্তার পাশে এই বাংলো—আর চতুর্দিকে ১৫ মাইলের মধ্যে কোন জনমানব নেই। সন্ধ্যের পরই অন্ধকার এবং স্তব্ধতা একসঙ্গে ছেয়ে আসে। মাঝে মাঝে শুধু ছু'একটা ট্রাক তীব্র আলো জ্বেলে ঝড়ের বেগে ছুটে যায়—ডাকাতির ভয়ে কোথাও না থেমে।

কয়েকদিন তাসটাস খেলে হৈ-হুল্লোড় করে কাটলো। তারপর আর সন্ধ্যে কাটতে চায় না। কি বিপুল দীর্ঘ সন্ধ্যেগুলো। সুতরাং একদিন ১৮ মাইল দূরে ওরা ওঁদের গ্রামে হাট হবে শুনে আমরা ছুপুরবেলাই একটা ট্রাক ধরে চলে গেলাম। চাল, হাঁস, মুরগী, কাচের চুড়ি, আয়না আর হাঁড়িয়া ও জুয়ার আড্ডা নিয়ে ছোট্ট গ্রাম্য-হাট। সন্ধ্যের পরই ভেঙে গেল। তখন সমস্যা হলো আমাদের ফেরা নিয়ে। কি করে অতখানি রাস্তা ফিরে যাবো—কোনো ট্রাক আমাদের নিতে চায় না। শেষে একটা সিমেণ্টের ট্রাক আমাদের পৌঁছে দিতে রাজী হল বাদগাঁও পর্যন্ত। সেখান থেকে আমাদের বাংলো ছ'মাইল। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জমাট অন্ধকারে পাকা পিচের রাস্তা ধরে চুপচাপ হাঁটছিলুম আমরা খুব সাবধানে। যে কোনো সময় ছুটন্ত ট্রাক আমাদের চাপা দিয়ে যেতে পারে—এখানে আর কে দেখছে। হাঁটতে একদম ভাল লাগছিল না—শেষে, কে এই হাটে আসার প্রস্তাব দিয়েছিল সেই নিয়ে খিটিমিটি বেধে গেল। তারপর তুমুল ঝগড়া।

আমি ঝগড়ায় এমন উন্মত্ত হয়ে গেলাম যে, পাহাড়ের ধার দিয়ে নীচে নেমে-যাওয়া একটা পায়ে-চলা রাস্তা দেখে বললুম, আমি ঐ রাস্তায় যাবো—ঐটাই সর্টকাট। কেউ আমার সঙ্গে যেতে রাজী হল না, দু'একজন আমাকে বারণ করলো। আমি তখন নামতে শুরু করেছি।

খানিকটা বাদে বুঝতে পারলুম কি ভুল করেছি। পায়ে-চলা পথ আর দেখা যায় না, মিলিয়ে গেছে জঙ্গলে। আমি নামার ঝোঁকে অনেকখানি নেমে এসে দাঁড়ালাম, বুঝতে পারলুম, ফেরার আর উপায় নেই। খাড়া পাহাড়—অতিকষ্টে ঝোঁক সামলে নীচে নামা যায়। কিন্তু ওপরে ওঠা যায় না। খানিকটা ওঠার চেষ্টা করে হাঁপিয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলুম এতদূর নেমে এসেছি যে, ওপরের রাস্তাটা আর দেখা যায় না। পায়ের কাছে অনেকটা সমতল হয়ে এসেছে—শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, কোথাও এক বিন্দু আলোর চিহ্ন নেই। আমার সঙ্গে হাট থেকে কেনা একটা বাঁশের ছড়ি—আর কিছু না, একটা টর্চ না পর্যন্ত। আমি জঙ্গলে পথ হারালাম।

মনে আছে সেই রাত্রির কথা। ভাল্লুক আর চিতাবাঘ বেরোয় ঐ জঙ্গলে শুনেছিলাম, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর পাহাড়ে চিতিবোড়া সাপ, যার একটা আমরা আগের দিন নিজেরাই দেখেছিলাম। বন্ধুদের নাম ধরে ডাকলুম। কোনো সাড়া নেই। ওরা শুনতেও পাচ্ছে না বা এগিয়ে গেছে। বেশী ডাকতেও সাহস পেলুম না—শব্দ করতে যেন ভয় করছিল। পাগলের মতো হন্যে হয়ে ছুটতে লাগলুম। তারপর একবার ক্লান্ত হয়ে বসলাম এক খণ্ড পাথরের ওপর। ছড়িটা দিয়ে চারপাশ পিটিয়ে দেখে নিলাম সাপ আছে কিনা কাছে। বসে থেকে এমন অসহায় লাগতে লাগলো। কোনো গাছের ওপর বসে যে রাত কাটাবো তারও উপায় দেখলুম না—লম্বা লম্বা শালগাছগুলো অনেকদূর উঠে গেছে সিধেভাবে—তারপর ডালপালা ছড়িয়েছে। ও গাছে চড়া আমার সাধ্য নয়।

চুপ করেই বসে রইলুম। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া দিল, কেঁপে উঠলো গাছের পাতাগুলো। আমি স্পষ্ট গলায় আওয়াজ শুনতে পেলাম, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! ফিস্‌ফিস করে কেউ বললো আমার মাথার উপরের গাছটা থেকেই। আমি একটু নড়েচড়ে বসলুম। আবার এক ঝলক হাওয়া দিতে সামনের গাছ থেকে ফিস্‌ফিস্ শব্দ হল, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! আমি উপরের দিকে তাকালুম। দুটো গাছ যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলছে, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! তারপর বেশ জোরে হাওয়া দিল একবার—আশেপাশের সবগুলো গাছ বলে উঠলো: আহা-হা, লোকটা, লোকটা!

মনের ভুল সন্দেহ কি। কিন্তু এরকম মন বা কানের ভুল হবেই বা কেন? শুনেছি মরুভূমিতে অনেক লোক পাগল হয়ে যায়, আমিও কি শেষে জঙ্গলে? উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। বেশ হাওয়া দিচ্ছে তখন, সারা বন বলছে, আহা-হা, লোকটা, লোকটা! নিষ্ঠুর কৌতুকের নয়, করুণ, সহানুভূতিময় সেই স্বর, যেন শত শত বৃক্ষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—আমি ছুটতে লাগলুম।

হঠাৎ একবার বাতাস থেমে গেল। তারপর আর এক ঝলক বাতাস বইতেই আমি অন্যরকম কথা শুনতে পেলুম। এইখানেই অলৌকিক দৃশ্যের আরম্ভ। আমি থেমে দাঁড়ালুম। এবার শুনতে পেলুম—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এই প্রথম শিহরণ হলো। গাছের পাতাগুলো দুলে দুলে সর সর শব্দ করে আমাকে বলছে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আমি পিছন ফিরে হাঁটতে লাগলুম। আবার শুনতে পেলাম: ওদিকে নয়, ওদিকে নয়।

চিৎকার করিনি, কিন্তু মনে মনে জিজ্ঞেস করলুম, কোন্ দিকে? বোবা বৃক্ষেরা কথার উত্তর দেয় না। শুধু নিজেরা কথা বলে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। কি রকম বোবা ওরা কি জানি।

আমি ডানদিকে ঘুরলুম। আর কোনো কথা নেই। হাওয়া থেমে গেছে। এবার সবাই আমাকে দেখছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। ডান দিকেই হাঁটতে লাগলুম। বেশ কিছুটা হাঁটার পর আবার হাওয়া উঠলো। আবার শব্দ উঠলো, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। থেমে দাঁড়িয়ে আবার ডান দিকে বাঁক নিলুম। তখনও শব্দ ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। দাঁড়িয়ে বাঁদিকে বাঁক নিলুম। শব্দ থেমে গেল।

তারপর যতক্ষণ হেঁটেছি—ভুলে গিয়েছিলাম বাঘ-ভাল্লুক বা সাপের কথা। শুধু উৎকর্ণ হয়ে শুনেছি গাছের পাতার সরসরানি। মাঝে মাঝে থেমে ওদের নির্দেশমতো চলেছি। একটু পরেই দেখতে পেলুম, দূরে ডাক-বাংলোর আলো, শুনতে পেলুম বন্ধুদের গলার আওয়াজ।

॥ ১৭ ॥

মানিকতলার দিকে রাস্তা ঘাট ভালো চিনি না। তাই এক রাস্তা খুঁজতে গিয়ে অন্য রাস্তায় চলে যাই। একটা সরু গলি দিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে এমন একটা চওড়া রাস্তায় এসে পড়লাম, যার দু'দিকের সব বাড়িগুলোই নতুন। সম্ভবত রাস্তাটাই নতুন। কিন্তু রাস্তাটা ভালো নয়। চতুর্দিকে এখানে খোঁড়াখুড়ি চলছে, জলকাদা জমে আছে। একটা শ্রাদ্ধ বাড়িতে নেমন্তন্ন বলে সেদিনই আমি আবার ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছি।

অভ্যেস নেই ধুতি-পাঞ্জাবী পরার, নেহাৎ মায়ের নির্দেশে পরতে হয়েছে। যে কোন সময় ধুতির কোঁচা খুলে যাবার ভয়। তার ওপর আবার কাদা বাঁচিয়ে চলতে হবে।

বেশী সাবধান হবার জন্য আমি ফুট-পাথের ধার ঘেঁসে হাঁটছিলাম। একটা ছোট ব্যালকনির নীচ দিয়ে যাবার সময় ওপর

থেকে কি যেন পড়লো আমার গায়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল গরম জল। তারপর তাকিয়ে দেখি আমার জামাটায় খুন খারাপি রঙের আধুনিক ছবি। কেউ ওপর থেকে পানের পিক ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওপরের দিকে তাকালাম। কেউ দ্রুত পালিয়ে গেল ভেতরে, এটা বুঝলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না কাউকে।

জামাটার অবস্থা দেখে আমার প্রায় কান্না পাওয়ার জোগাড়। সত্ত পাট ভাঙা আদ্দির জামায় পানের পিকের রং সাঙ্ঘাতিক খুলেছে। আমার ঘেন্না ঘেন্না করতে লাগলো। পানের পিক মানে তো অন্য একজনের এঁটো থুতু। ঘেন্নার সঙ্গে সঙ্গে রাগও চড়তে থাকে।

ঝিমঝিমে দুপুর, রাস্তাটায় আর লোকজন নেই। একটা রিক্সাওয়ালা শুধু যেতে যেতে আড় চোখে দেখছে আমাকে। নিশ্চয়ই লোকটা মুখ ফিরিয়ে হাসছে।

যে বাড়ির লোক এই অপকীর্তি করেছে, সেই বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে কৈফিয়ৎ চাইবো? যদি অস্বীকার করে? এ পাড়ায় আমি অচেনা, যদি ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেয়?

একটু দূরে একটা পানের দোকান, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। শুনেছি চুন ঘষলে লাল রং মিলিয়ে যায়।

দোকানদারকে বললাম, ভাই একটু চুন দেবে?

লোকটি আমার সর্বাঙ্গ ভালো করে দেখলো, তারপর ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, ও চুন ঘষলেও কিছু হবে না। বাড়ি নিয়ে গিয়ে এখুনি জলে ডুবিয়ে দিন।

বাড়ি আমার অন্তত পাঁচ মাইল দূরে, সেখানে এক্ষুনি পৌঁছানো যায় না। তাছাড়া আমার শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাওয়ার কথা। শ্রাদ্ধ বাড়িতে কেউ রঙীন জামা পরে যায় না বলেই প্যান্ট সার্ট ছেড়ে আজ আমার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসা। সেই পাঞ্জাবির এই পরিণতি!

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য (আমি) সিগারেট কিনে ধরালাম। চোখ রাখলাম সেই ব্যালকনির দিকে। সব অপরাধীই অকুস্থলে ফিরে আসে একবার না একবার। যে পানের পিক ফেলেছিল, সে আসবে না?

বাড়িটা ছাই রঙের। তিনতলা। কিন্তু বারান্দাটা দোতলায়। ঘর ও বারান্দা—মাঝখানের কাচের দরজাটা খোলা। ভেতরে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে কেউ হাঁটা চলা করছে, এটা বোঝা যায়। আমি চোখ খর করে রইলাম।

একটা সিগারেটের পর আর একটা। না দেখে যাবো না। দেখতেই হবে, কে আমাকে আজ এমন বিপদে ফেললো।

হঠাৎ একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে দৌড়ে এলো বারান্দায়। রেলিং ধরে ঝুঁকে ডাকলো। রিক্সা রিক্সা!

আমি দেখলাম মেয়েটির ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। পিঠের ওপর চুল খোলা। হলুদ শাড়ী পরা। দুপুরের রোদ্দুরে সেই শাড়ীটা যেন জ্বলজ্বল করছে।

রাস্তা দিয়ে একটা রিক্সা যাচ্ছিল। মেয়েটির ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো। মেয়েটি বোধ হয় ঘরের ভেতর থেকেই রিক্সাটা দেখতে পেয়েছিল। সে আর কোনোদিকে তাকালো না বলেই সন্দেহ হয় যে সে জানে। সে একটা অপরাধ করেছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐ টুকটুকে লাল রঙের ঠোঁটের জন্য মেয়েটিকে বেশী সুন্দর দেখালো। পান খাওয়া সবাইকে মানায় না ওকে মানিয়েছে।

কোনো বুড়ো টুড়োর পানের পিক যে আমার জামায় পড়েনি, সেটা জেনে আমার ঘেন্নার ভাবটা একটু কমলো। কিন্তু মেয়েটির তো উচিত আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া। মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকালো না পর্যন্ত! এটা অন্যায়।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরেই মেয়েটি নেমে এলো নীচে। একা। রিক্সায় উঠে বসে বললো, চলো।

রিক্সাটা এদিক দিয়েই যাবে। আমমি মোড়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। একবার ভাবলাম মেয়েটিকে ডাকবো। পরে মত বদলালাম। অচেনা রাস্তা, একটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে ডেকে কথা বলতে গেলে যদি কেউ অন্যরকম কিছু ভাবে? মেয়েটি যদি পানের পিক ফেলার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে?

ঠিক আছে, ওকে ক্ষমা চাইতে হবে না ও শুধু দেখুক। দেখে লজ্জা পাক অন্তত। ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো দিন বারান্দা দিয়ে রাস্তায় পানের পিক না ফেলে।

মেয়েটি একবারও তাকালো না আমার দিকে। আগাগোড়াই অন্য ফুটপাতের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলো, রিক্সাটা চলে গেল বড় রাস্তায়।

আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনে হলো এরকম দুঃখ আমি বহুদিন পাইনি। দুঃখ এবং অপমান।

আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। বড় রাস্তায় এসে পড়ার পর বুঝলাম, সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। এরকম ভাবে হাঁটা যায় না। রিক্সা নিয়ে চলে যাবো শ্রাদ্ধবাড়ি? এই পোষাকে? সেখানেও যদি সবাই আমাকে দেখে হাসে? শোকের বাড়িতে হাসি ঠাট্টার বিষয়বস্তু হওয়া কি ভালো?

কাছাকাছি একটা টিউবওয়েল দেখে পাঞ্জাবীটা খুলে ফেললাম। পানের পিকলাগা জায়গাটা ধুয়ে ফেললে যদি কোনো সুরাহা হয়। কোনো কালে জামা-কাপড় কাচার অভ্যেস নেই আমার। অনভিজ্ঞ হাতে ধুতে গিয়ে পুরো জামাটাই প্রায় ভিজে গেল সেটা আবার পরবার পর মনে হলো। আমি যেন দোল খেলে ফিরছি।

ঘটনাটা আমি বেশ কিছুদিন ভুলতে পারিনি। মেয়েটির মুখ আমার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। তিন চারদিন বাদে আর একবার উত্তর কলিকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন হতে আমি মানিকতলার সেই গলিটাতে আর একবার গেলাম। যদি মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা হয়। দেখা হলে আমি কিছুই বলতাম না হয়তো। একলা

হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বললাম, আমার দিকে একবার অন্তত তাকানো উচিত ছিল না কি ?

আরও দিন চারেক বাদে, এসপ্লানেড পাড়ার একটি সিনেমা হলের দোতলার সিঁড়ি দিয়ে একটি হলদে শাড়ী পরা মেয়েকে উঠে যেতে দেখে আমার বুকটা ঠক্ করে উঠলো এই তো সেই মেয়েটি ! ওর মুখ দেখতে পাইনি, তাড়াপাড়ি উঠে হলের মধ্যে ঢুকে গেল, পেছন থেকে চুলটা মনে হলো অবিকল সেই রকম।

কী করে ওকে খুঁজে পাওয়া যায় ? শো আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার টিকিট নীচের তলায়, সেখানে বসে আমি ছট ফট করতে লাগলাম। একবার সন্দেহ হলো, হয়তো সেই মেয়েটি নয়। সেদিন সে হলদে শাড়ী পরেছিল, আজও তাই পরবে ? মেয়েরা কি একই শাড়ী এত তাড়াতাড়ি পরে ?

ছবি শেষ হবার পর আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে রইলাম তীক্ষ্ণ চোখে। কিন্তু সেই মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। এমনকি সেই রকম হলুদ শাড়ী পরা কোনো মেয়েকেই দেখলাম না। তা হলে কি আমার চোখের ভ্রম ? কিংবা, মেয়েটি কি আমাকে দেখে ভয় পেয়ে আগেই বেরিয়ে গেছে ? মেয়েদের তো পিঠেও একটা করে চোখ থাকে, তাতে তারা সব কিছুই দেখতে পায়।

কয়েকদিন বাদে আমার মনে হলো। এটা আমার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। কেন ঐ একটি মেয়ের কথা আমি বারবার ভাবছি। কেন ওকে নানান জায়গায় খোঁজার চেষ্টা করছি ? সামান্য একটা ব্যাপার, মেয়েটি ভুল করে পানের ফেলেছিল, ওর নিশ্চয়ই সে কথা আর মনে নেই। আমার সঙ্গে যদি দৈবাৎ মেয়েটির কোথাও দেখা হয় ও আমাকে নিশ্চিত চিনতে পারবে না। কি করে চিনবে ও তো আমাকে দেখেই নি।

পাঞ্জাবীটা ডায়িং ক্লিনিং থেকে কেচে এসেছে, কোনো দাগ আর নেই। সুতরাং আমার মন থেকেও দাগ মুছে ফেললাম।

আমি মেয়েটিকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি মনে মনে তার উদ্দেশ্যে বললাম। তোমার আর অস্বস্তিতে থাকার দরকার নেই, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, বুঝলে? সত্যই ক্ষমা করে দিয়েছি।

এরপর বছরখানেক কেটে গেছে। আমার মাসতুতো বোন সুজয়ার বিয়েতে আর একটা ঘটনা ঘটলো। আমার নেমন্তন্ন খাওয়া হয়ে গেছে, সুজয়ার সঙ্গে দেখা করেই কেটে পড়ার ইচ্ছে। বাসর ঘরে সাঙ্ঘাতিক ভিড়। দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছি।

বারান্দায় একপাশে সুজয়ার ছোট বোন সুস্মিতা তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। একটি ছেলে প্লেটে করে কিছু পান নিয়ে যাচ্ছিল, সুস্মিতা তাকে ডাকলো। বন্ধুদের সে পানগুলো বিলি করে দিল। তার এক বন্ধু বললো, আমি পান খাই না।

সুস্মিতা আমাকে ডেকে বললো, সুনীলদা। তুমি পান খাবে? আমি বললাম। না রে।

সুস্মিতা তার বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ করাতে চাইল। যে-মেয়েটি বলেছিল, আমি পান খাই না, তার নাম গীতি। বেশ লম্বা, কায়দা করে খোঁপা বাঁধা, একটা সবুজ সিল্কের শাড়ী পরা।

আমাকে হাত জোড় করে নমস্কার করে সে হঠাৎ মুচকি হেসে বললো, আমি মানিকতলায় থাকি। আমি পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

আমি চমকে উঠলাম। মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। তাকে আমার চিনতে পারার কোনো কথাই নয়। কিন্তু সে কি করে আমাকে চিনলো? নইলে নিজের থেকে এ কথা বললো কেন?

হঠাৎ বাসরঘর থেকে ভিড়ের একটা ঢেউ বেরিয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো আর একটা ঢেউ। আমরা ছিটকে গেলাম। সেই মেয়েটিকে দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে। তার সঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ পেলাম না।

কেন সে পান খাওয়া ছাড়লো? আমি তো তাকে একদম ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। এবং একথাও ঠিক, পান খেয়ে লাল করলে তার ঠোঁট দুটি বেশী মানায়। একথা তাকে বলা হলো না। সে আমাকে হারিয়ে দিল একেবারে।

॥ ২০ ॥

মাঠের মাঝখানে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। কেন এরকম হঠাৎ হঠাৎ ট্রেন থেমে যায়, কেউ জানে না। তবু থামে। যথারীতি অসহ্য ভিড়। বহু লোক দাঁড়িয়ে। যারা দাঁড়িয়ে—চলন্ত ট্রেনের চেয়েও থেমে-থাকা ট্রেনে তাদের কষ্ট যেন বেশী। বাইরের মাঠে হা-হা করছে রোদ। খালগুলি প্রায় শুকিয়ে গেছে, তার ধারে ধারে বসে আছে কয়েকটা নিথর বক। আশ্চর্য ওদের ধৈর্য।

আমি একটা বসবার জায়গা পেয়েছিলাম, জানলার ধারেই। সুতরাং অন্যান্য অনেক যাত্রীর তুলনায় আমাকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বলা যায়। যদিও গায়ের ওপর লোকজন হুমড়ি খেয়ে খেয়ে পড়ছে, অসহ্য ঘামের গন্ধ। এর মধ্যে আছে আবার নানান ফেরিওয়ালা।

দূর থেকে একটা গান ভেসে আসছে। বাউল গান। ট্রেনে এরকম হরদম শোনা যায়। অল্প বয়েসী ছেলের গলা। মন্দ নয়, শুনতে বেশ ভালোই লাগছিল।

কেন যেন গানটা শুনতে শুনতে মনে হলো, ছেলেটা অন্ধ। এরকম মনে করার কোন কারণই নেই। কণ্ঠস্বর শুনে অন্ধ কিনা বোঝা যাবে কি করে। তবে, ট্রেনে অনেক সময়েই অন্ধ ভিখিরির গান শুনতে পাই, সেই জন্যই বোধহয় এরকম মনে এসেছিল।

গানটা ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। এক সময় শোনা গেল আমাদেরই কামরাতে। তাকিয়ে দেখলাম, একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর, পুরোদস্তুর বাউলের পোষাক, হাতে একটা একতারা এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যিই ছেলেটি অন্ধ! হঠাৎ এই সব ব্যাপার মিলে গেলে কি রকম যেন একটু ভয় করে।

ছেলেটির গানের গলা বেশ ভালোই। বেশ জোরালো। পর পর গেয়ে যাচ্ছে এবং অন্য কারুর সাহায্য না নিয়েই সে ভিড় ঠেলেঠুলে এগুচ্ছে।

সব সময় ভিখিরিকে আমি ভিক্ষে দিই না। কিন্তু কারুর গান শুনে যদি ভালো লাগে, তবে সেই সঙ্গীত শিল্পীকে কিছু পারিশ্রমিক নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো পয়সা বার করে হাতে রাখলাম।

ছেলেটি বেশ ভালোই পয়সা পাচ্ছিল, হাত ভরা তার খুচরা পয়সা। একবার একটি লোকের সঙ্গে তার কি যেন একটা কথা হলো। আমি দূর থেকে শুনতে পেলাম না। হঠাৎ ছেলেটি গান থামিয়ে জোর করে সবাইকে ঠেলে এগুতে লাগলো। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি তাকে বললাম, এই যে একটু দাঁড়াও।

সে বোধহয় শুনতে পেল না। থামলো না।

আমি তার একটা হাত ধরে আমার পয়সাটা গুঁজে দেবার চেষ্টা করলাম।

সে হাতের একটা ঝটকা মারলো, পয়সাটা ছিটকে পড়লো মাটিতে।

আশেপাশের কয়েকজন লোকও অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা কেউ কেউ বললো, এই যে সুরদাস, একটু দাঁড়াও—বাবু তোমাকে পয়সা দিচ্ছেন।

ছেলেটি এর পরে আর একটি আশ্চর্য কাণ্ড করলো। সে অন্য হাতের পয়সাগুলোও ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। অনেকগুলো পয়সা।

তারপর দরজার কাছে হ্যাণ্ডেল ধরে লাফিয়ে নেমে পড়লো মাটিতে। হন হন করে একদিকে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

ঘটনাটা রহস্যময়। কিন্তু আজও আমি ছেলেটার ঐ রকম রাগের কোনো ব্যাখ্যা পাই নি। সে কেন হঠাৎ সব পয়সা ফেলে দিল? ভিখিরির কি এত রাগ মানায়? যে-লোকটির সঙ্গে তার শেষ কথা হয়েছিল, আমরা সকলেই সেই লোকটির দিকে তাকালাম। সে বললো কই, আমি তো তেমন কিছু বলিনি। আমি শুধু বললাম, ডান দিকে যাও।

এর পর সমস্যা দাঁড়ালো, ঐ পয়সাগুলো কি হবে? এতগুলো পয়সা মাটিতে পড়ে থাকলে দেখতে বিশ্রী লাগে। অথচ সকলেই তাকিয়ে আছে সেদিকে।

আমার পাশের এক ভদ্রলোক বললেন, আপনার সিকিটা—

তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন। আমি হাত চেপে ধরে বললাম, থাক।

আমার সিকিটা অত পয়সার মধ্যে মিশে গেছে। নিজের সিকিটা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। অন্য পয়সাই বা আমি নিই কি করে? ভিক্ষের পয়সা।

তারপর ট্রেন ছাড়লো। এত ভিড়ের মধ্যেও সকলেই এমনভাবে দাঁড়ালো, যাতে ঐ পয়সাগুলোর ওপর পা না পড়ে। একজন কেউ গোপনেও একটা পয়সা নিল না।

যেন ঐগুলো পবিত্র পয়সা, অন্য কারুর হাত দেবার উপায় নেই।

॥ ২১ ॥

ক্লিয়োপেট্রার যদি নাকটা একটু ছোটো হতো, তা হলে সীজার কিংবা এ্যান্টনি অমনভাবে হয়তো তার প্রেমে পড়তেন না। অত সহজে তা হলে কি আর ভেঙ্গে যেতো রোমান সাম্রাজ্য—খৃষ্টধর্ম হতো আরও বিলম্বিত, পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো হতো অন্যরকম। অথবা, তারও আগে, মদ খেয়ে বন্ধুর সঙ্গে মারামারি করে অত অল্প বয়সে যদি মারা না যেতেন মহাবীর আলেকজান্দার, তা হলে ম্যাসিডোনিয়ার ঐ তেজী ছোকরা পৃথিবীর চেহারা কি রকম করে দিতেন কে জানে। তাঁর মৃত্যুর পরই অমন করুণ দশা হতো না বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্যের, আর একবার কি ভারতবর্ষের শেষ দিকে এই বাংলা দেশ পর্যন্ত আসার চেষ্টা করতেন না! কিংবা ওয়াটালু'র মাঠে যদি হঠাৎ বৃষ্টি না হতো, যদি রোখা না যেতো নেপোলিয়নকে, তা হলে আমরা আজ নিশ্চিত ইংরেজির বদলে ফরাসী শিখতুম। টিপু সুলতানকে অত সহজে ঘায়েল করে ভারতে মাঠে মাঠে আর ইংরেজের বিউগল্ বাজতো না তবে। কিংবা নর্মাণ্ডি অবতরণের সময় হিটলার যদি স্লিপিং পিল খেয়ে না ঘুমোতেন—যদি তিনি প্যানজার বোমারু বাহিনী ছেড়ে দেবার হুকুম দিতেন—তা হলে কোন্দিকে ঘুরে যেতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে জানে, কে জানে ঐ রণদুর্মদ রক্ত পাগল পৃথিবীতে আরও কত কেলেংকারীর স্রোত বইয়ে দিতেন।

ইতিহাসের অনেক বিশাল সন্ধিক্ষণে এমন অনেক মজার ছোটোখাটো ঘটনা আছে। জয়পালের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অমন বদ মতলব যদি পৃথ্বীরাজের না হতো—তা হলে ভারতে ইসলাম সাম্রাজ্য আরও কত বিলম্বিত হত বা আদৌ হতো কিনা অমন জল্পনা করার লোকের অভাব নেই। একজন লেখক

লিখেছেন—নর্মাণ্ডিতে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের আসল কারণ নাকি রোমেলের স্ত্রীর জন্য এক জোড়া সাদা জুতো। রোমেল কারুকে না জানিয়ে বিবাহ বার্ষিকীতে স্ত্রীকে উপহার দেবার জন্য ফ্রন্ট ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। নইলে রোমেল থাকলে অত সহজে—। হয়তো, এসব জল্পনাই। ইতিহাস অত সহজে বদলায় না, সে তার নিজস্ব গতি নেবেই।

পৃথিবীর কয়েকটি ভৌগোলিক বদল সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। কয়েকটি ভৌগোলিক পরিবর্তন মানবসভ্যতার কি আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে. সেগুলি না ঘটলে এ পৃথিবীকে নিশ্চিত অন্য পৃথিবী মনে হতো। যেমন হিমালয় পর্বত যদি না থাকতো ভারতের উত্তরে, সাহারা মরুভূমি যদি মরুভূমি না হতো সত্যিই। অর্থাৎ যেমন ছিল আগে।

ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, যেখানে এখন হিমালয়, আগে সেখানে ছিল এক অতি গভীর সমুদ্র, নাম তার টেথিস্, হিমালয় তার কত নীচে ডুবে ছিল কে জানে। অসম্ভব ছিল না ডুবে থাকা। হিমালয়ের উঁচু শিখর এভারেস্টের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ মাইলের কাছাকাছি পৃথিবীর গভীর মহাসমুদ্রগুলির এখনও কোথাও কোথাও গভীরতা ছ' মাইলের বেশী। যাই হোক, তারপর একদিন প্রকৃতির খাম-খেয়ালে হল বিষম ভূমিকম্প, টেথিস্ সাগর গড়িয়ে এলো ভারতের নীচের দিকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অনেকখানি ভূভাগ, দূরে সরে গিয়ে এখন তার নাম অষ্ট্রেলিয়া, জন্ম হলো দুটি ছেলেমেয়ে উপসাগর সমেত ভারত মহাসাগরের।

হিমালয় না থাকলে কি হতো ভারতবর্ষের? কাব্য সাহিত্যের হে সমূহ ক্ষতি হতো—তা ঠিকই, ম্রিয়মাণ কালিদাসের মুখ এখনই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে কোনো পাহাড় নেই, তাদের কাব্য সাহিত্য কিন্তু সেজন্য কম সম্পদশালী নয়, তারা সমুদ্রের বন্দনা করেছে।

এ ছাড়া বাস্তুচ্যুত হতেন জগন্মাতা দুর্গা সমেত মহাদেব, পদব্রজে

স্বর্গে যাবার কোনো উপায় থাকতো না যুধিষ্ঠিরের। কোথায় থাকতো পুণ্যসলিলা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুই বা যেতো কোথায়। হিমালয়ের গায়ে অনেক জলজ জন্তু-মাছের অস্থিজীবাশ্ম পাওয়া গেছে, কিন্তু তবুও মুনি-ঋষিরা অপবিত্র জ্ঞানে তাকে কখনও বর্জন করেন নি, ঐ নাগাধিরাজের গুহা কন্দরেই একদিন ভারতবর্ষের মহা ওঙ্কার ধ্বনি প্রথম জেগেছিল।

হিমালয় ব্যতীত ভারতবর্ষ হতো শীত প্রধান দেশ। সাইবেরিয়া থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতো সারা বছর, আমরা সবাই হতুম ফর্সা লোক। মৌসুমী হাওয়া হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে সারা উত্তর ভারতে যে বৃষ্টি ছড়াচ্ছে—সেটা পাওয়া যেত না। বঞ্চিত হতুম বিশাল অরণ্য সম্ভার থেকে। ঐ বিশাল প্রহরী না থাকলে রাশিয়া থেকে ভারত আক্রমণ হতো বহুবার নিশ্চিত।

হিমালয় না থাকলে নেপাল-ভুটান-সিকিম-তিব্বতের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না আমাদের। পাহাড় ঘেরা ছিলুম বলে বহুকাল আমরা শুধু ভারতবর্ষকেই সারা পৃথিবী বলে জানতুম। হিমালয় বাইরের শত্রুর কাছে ভারতকে দুর্ভেদ্য করেছিল, আবার, তার বিপরীত অর্থে, ভারতের বাইরে ভারতের ক্ষমতা বিস্তারের কথা কখনও মনে পড়েনি। ফলে, আমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে গেছে রক্ষণশীল। এখনও তার জের চলছে—কিন্তু কে না জানে, আন্তর্জাতিক গুণ্ডামিতে সব সময় রক্ষাত্মক ভঙ্গী নিলে, শেষ পর্যন্ত আর আত্মরক্ষা করা যায় না। সেই জন্যই বাইরের শত্রু এসে বহুবার অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের পর্যুদস্ত করেছে। চোখের সামনে অমন গগনভেদী পাহাড়—তারই বন্দনা করেছি আমরা, ঐ বিশাল রহস্যের ভেদ করতে চাইনি বলে আমাদের জাতীয় চরিত্রও হয়ে গেছে মিষ্টিক। আমরা সমুদ্রকে উপেক্ষা করেছি। অথচ সমুদ্রজয়ী জাতিগুলিই একদিন পৃথিবী জয় করেছে। হোমার লিখলেন, ইউলিসিসের অজানা সমুদ্রের অভিযান, আর আমাদের দৌড় লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত, তাও সেতুবন্ধন করে, জাহাজ-টাহাজ নয়,

জলস্পর্শ বারণ! প্রাচীন হিন্দুরাজারা নৌবিদ্যায় রয়ে গেলেন অজ্ঞ—তারপর মুসলমান শাসকরা এলো আরবের মরুভূমি, পাহাড় থেকে, তারা ভাল করে সমুদ্র চোখেই দেখেনি! উত্তরে হিমালয় ভারত পাহারা দিচ্ছে, এই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রায় তিন দিকের উপকূল রয়ে গেল চিরকাল অরক্ষিত।

হিমালয় না থাকলে ভারতের দক্ষিণে আরও জমি থাকতো। জনসমস্যার সমাধান হয়ে যেতো কত সহজে। আলাদা হতো না সিংহল, সুতরাং সিংহল প্রবাসী ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার কোনো কথাই উঠতো না। যে স্থলভূমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওখান থেকে তা যদি হয় আজকের অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ, বাংলাদেশের নীচের ভাঙা জায়গায়—সারা বঙ্গোপসাগর জুড়ে কি চমৎকার ফিট করে যায়—তা হলে, আরও অতখানি জমি থাকতো ভারতের অধিকারে, কি বিশাল হতো বাংলা দেশ, বিভক্ত হলেও উদ্বাস্তু সমস্যা থাকতো না নিশ্চিত। তার বদলে, আজ সেই অস্ট্রেলিয়ায় জুড়ে বসেছে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসে ইওরোপিওরা, আজ এমন স্পর্ধা তাদের যে, কালো লোকদের—ভারত সমেত, —ইমিগ্রেশান বন্ধ করে দিয়েছে তারা।

তা হলে হিমালয়কে নিয়ে অত উচ্চতার গর্ব থাকতো না আমাদের—তাও তো এভারেস্ট চূড়া ঠিক ভারতবর্ষের নয়, নেপালেরই প্রায়,—কিন্তু ভারতের ব্যাপ্তি হতো আরও বিশাল, চীনের সমকক্ষ। তাহলে শীতকালে, সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জুঁই ফুলের মতো, বরফ পড়তো, ভারতের আবহাওয়া হতো অনেকটা আমেরিকারই মতো কিনা।

ভূগোলের এই রকম আর একটা খামখেয়াল ঘটেছিল সাহারা মরুভূমিতে। ভুতাত্ত্বিকরা যাঁকে বলেন চতুর্থ বরফ যুগ, সেই সময় আফ্রিকা ছিল অনেক সুযোগভুক্ত, সাহারা ছিল শ্যামল জলাভূমি। ওখন কি দুর্দশা ইওরোপের, সমগ্র উত্তর ইওরোপ বরফে ঢাকা আল্পাস্ ও পিরেনিজ থেকে বিশাল বিশাল বরফের চাঁই নেমে

আসতো। প্রায় গোটা ইওরোপই ছিল মানুষ্যবাসের অনুপযোগী, ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোমশ হাতী, পশম ওলা গণ্ডার। আর সাহারায় তখন অগভীর জল, নলখাগড়ার বন, নানারকম ছোট সাইজের জানোয়ার, অনেক সুস্বাদু মাছ—আর এক জাতের মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে সেগুলো মেরে মেরে বেশ সুখে আছে। টাট্‌কা মাছ, মাংস আর বনের ফলমূল, তখনও আগুনের ব্যবহার আসেনি, সুতরাং রাগ হিংসা আসেনি। সেই সময় যদি সভ্যতার ভোর শুরু হতো।

কিন্তু তা হয়নি। আরম্ভ হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বরফ সরে যেতে লাগলো আর্কটিক মহাসমুদ্রের দিকে—সারা ইওরোপে জন্মালো অসংখ্য চারাগাছ, কত রকমের ঘাস ফুল। ফুল থেকে এলো ফল, তারপর বনস্পতি, সুবাতাস, যাযাবর মানুষ। ইওরোপ হয়ে উঠলো মনুষ্যবাসের রম্যভূমি। আটলান্টিক থেকে বর্ষার জোলো হাওয়া মুখ ফিরিয়ে বইতে লাগলো উত্তর ইওরোপে, দিতে লাগলো সুফলা বৃষ্টি। সে হাওয়া আর মুখ ফিরিয়ে এলো না আফ্রিকা-এশিয়ার বিশাল ভূমিখণ্ডে, সাহারা শুকিয়ে গেল, হা-হা করতে লাগলো তৃষ্ণায়, পরিণত হলো পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমিতে। সেই মরুভূমিব ছোঁয়াচ লাগলো আশে পাশেও। আফ্রিকার আর জাগা হলো না।

যদি অচলাবস্থা বজায় থাকতো—তবে কে জানে, আফ্রিকানদের দর্পিত পদভারেই সারা পথিবী টলমল করতো কিনা এতদিনে। ইওরোপের বরফ গলতই একদিন—কিন্তু ততদিনে বৃষ্টিহীন আফ্রিকা যদি কালো না হয়ে যেতো—তবে, প্রস্তুত হয়ে থাকতো একদল সংঘবদ্ধ মানুষ, তারাই বেরিয়ে পড়তো ইওরোপ দখলে। প্রকৃতির পরিহাসে তা তারা পারেনি, সাহারা থেকে ভ্রষ্ট প্রধান আদিম মানুষের দল যাযাবর হয়ে যায়। নিজেরা সভ্যতা গড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে—তাই সভ্যতার ওপর জাতক্রোধ জন্মে যায় হয় তো তদের। পৃথিবীর নানান সভ্যতা এদের প্রচণ্ড আক্রমণে

বারবার কেঁপে উঠেছে। দুর্ধর্ষ তাতার, হুণেরা ঐ যাযাবরদেরই বংশধর।

সাহারা যদি শস্যশ্যামলই থাকতো, আর ইওরোপ বরফ ঢাকা—তা হলে কি হতো পৃথিবীর ইতিহাস কে কল্পনা করতে পারবে। এত দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকার বদলে আজ আফ্রিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির হয়তো হতো জয়জয়কার। হয়তো নিগ্রোদের মতো কালো হওয়াই হতো খুব সুন্দর হওয়ার চিহ্ন।

॥ ২২ ॥

সেই কলেজে পড়ার সময়ে বন্ধুবান্ধবেরা মিলে দল বেঁধে একবার ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে গিয়েছিলাম। ব্যাঙ্ক বলতে সেইটুকুই যা আমার জানা ছিল। ব্লাডব্যাঙ্ক ছাড়া আর কোনো ব্যাঙ্কে আমি অ্যাকাউন্ট খুলিনি দীর্ঘকাল।

তারপর এই কিছুদিন মাত্র আগে, হঠাৎ আমি শ-খানেক টাকার একটা চেক পেলাম, নিশ্চিত পূর্বজন্মের ঘোরতর পুণ্যবলে। কিন্তু পূর্বজন্মের পুণ্যফল, বর্তমানের পাপ জন্মে সইবে কেন, সেই থেকেই শুরু হয়ে গেল আমার দুর্ভোগ। চেকখানা পাবার আগে কি সুখেই না ছিলাম যখন পকেটে পয়সা থাকতো না তখন মন-প্রাণ খুব সূক্ষ্ম হয়ে যেতো, কতরকম নতুন দার্শনিক তত্ত্ব তখন আমি আবিষ্কার করেছি। পকেটে টাকা থাকলেও খুব একটা অসুবিধে দেখা দেয়নি, টাকা মানে নিছক টাকা, এই মায়াময় জগতের আর একটি মায়ার টুকরো, এই আছে, এই নেই। টাকা জিনিসটার মানে ছিল খুব পরিষ্কার, এক টুকরো খাম নীলরঙের কাগজ যা নাকি পরের হাতে যাবার জন্য উদগ্রীব। ঐ এক টুকরো কাগজের এমন গুণ, যা পকেটে থাকলে শীতকালে গা গরম লাগে,

গরমকালে পৃথিবীটাকে মনে হয় এয়ারকণ্ডিসন্‌ড্‌, ঐ ছাড়পত্র হাতে নিয়ে চিনেবাদামওয়ালা থেকে শুরু করে সিনেমার কাউন্টারের সামনে পর্যন্ত অনায়াসে দাঁড়ানো যায়। টাকার মানে যখন শুধু এই ছিল, আহা, তখন বড় সুখের দিন ছিল আমার। ঐ চেকটা হাতে আসার পর থেকেই শুরু হলো বিপত্তি।

চেক জিনিসটা টাকাও বটে, আবার টাকা নয়ও। ওটার দাম একশো টাকা, কিন্তু চিনেবাদামওয়ালার সামনে কিংবা সিনেমা কাউন্টারে ওর কোনো মূল্য নেই। চেকটায় আমার নামলেখা ক্রশড্‌ চেক। ওটা ভিখিরিকে দান করতে গেলেও নেবে না, মুরগীর কাছে মুক্তোর মূল্য যেমন অর্থহীন। খুব খিদে পেটে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, পাঞ্জাবীর দোকান থেকে ভেসে আসছে ভুর ভুর মুরগী মশল্লার গন্ধ, কিন্তু যদিও আমি গ্যাসটিক আলসারের রুগী নই এবং একশো টাকার মালিক, সেই মুহূর্তে আমার খাবার কোনো উপায় নেই। টাকা হলেও ক্রশড চেক যেন ব্ল্যাক মানি, লোকের সামনে বার করার কোনো উপায় নেই। একমাত্র ব্যাঙ্কে নিয়েই নাকি চুপি চুপি জিনিসটা ভাঙাতে হয়।

সুতরাং জীবনের প্রথমবার, আসল ব্যাঙ্কে গেলাম। ঢোকার মুহূর্তেই আমার কেমন যেন ভয় ভয় করা শুরু হলো। তখন তার কারণ বুঝিনি, বুঝেছি অনেক পরে। তখন কল্পনাই করতে পারিনি কি গভীর বিপদের মধ্যে আমি ঢুকতে যাচ্ছি। ব্যাপারটা শুরু হলো এই রকমভাবে। তিন চারটি কাউন্টার ঘুরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হবার পর, একটি পান—চিবোনো হিটলারি গোঁপবাবু পরিষ্কার ভাবে আমাকে জানালেন যে আমার পক্ষে ঐ চেকের বিনিময়ে টাকা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ওটা যেহেতু ক্রশড্‌ চেক সুতরাং ব্যাঙ্কে আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার। আমি খুব বিনীত সরলভাবে জানালুম, দেখুন, আপনি বিশ্বাস করুন সই-টই জাল করা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। যিনি চেকটা আমায় দিয়েছেন, এতে তিনিই সত্যি সত্যি সই করেছেন,

এবং আমার অ্যাকাউন্ট নাইবা থাকলে; তাঁর তো সত্যিই অ্যাকাউন্ট আছে এ ব্যাঙ্কে। সুতরাং তাঁর টাকা থেকেই আমার পাওনা মিটিয়ে দিন না। টাকাটা সত্যিই আমার ন্যায্য পাওনা।

হিটলারি গোঁপ তবুও মুসোলিনি ধরণের হেসে (কারণ, হিটলার হাসতে জানতেন না শুনেছি) বললেন, উঁহু, আপনি নিজের অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আমি বললুম, কি মুস্কিল, আমি তো আর কারুকে টাকা দিতে যাচ্ছি না। আমি টাকা পাবো। সুতরাং আমি অ্যাকাউন্ট খুলতে যাবো কেন?

হিটলারি গোঁপের তবু সেই হিটলার সুলভ একগুঁয়ে কথা। আগে নিজের একটা অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আমি মরিয়া হয়ে বললুম, ঠিক আছে, খুলে নিন আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট।

—তাহলে টাকা নিয়ে ওদিকের কাউন্টারে যান।

টাকা? ব্যাঙ্ক থেকে আমি এসেছি টাকা নিতে, টাকা দিতে যাবো কেন? নিজের প্রাপ্য একশো টাকা পাবার জন্য, আমাকে পকেট থেকে আরও টাকা খরচ করতে হবে? যাই হোক। আমার পকেটে সেদিন কোনো টাকাকড়ির ব্যাপার ছিল না, বলে সেদিন চুপি চুপি এলাম ব্যাঙ্ক থেকে।

কত টাকা লাগবে কে জানে, সেই একশো টাকা ভাঙাবার জন্য আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে দশটা টাকা ধার করে আবার ব্যাঙ্কে এলাম। এবার যার কাছে আমায় আসতে হলো, তাঁর গলার ভারিক্কী স্বর শুনে মনে পড়ে সেই তার কথা যিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ ছদ্মবেশে স্বয়ং ধর্মরাজ। গমগমে গলায় তিনি আমায় বললেন, আপনার কোনো সাক্ষী আছে? আমি ভাবলুম, আমি তো কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়িনি, জ্ঞানত কখনো খুন কিংবা বাটপাড়ি করিনি, তবু আমার

সাক্ষী দরকার কিসে ? ভয়ে ভয়ে সেই সন্দেহ নিবেদন করলুম। গমগমে সেই কণ্ঠ আবার আমায় জানালো, আপনি যে আপনিই, তার প্রমাণ কি ?

এই জন্যই ওঁকে দেখে প্রথমেই আমার ধর্মরাজের কথা মনে হয়েছিল। খাঁটী কথা বলেছেন। আমি যে আমিই এর প্রমাণ কি ? আমি যে গাধা কিংবা ছুঁচো নই, দোলগোবিন্দ কিংবা তস্মলোচন কিংবা লালিমা পাল নই, তার প্রমাণ কি ? অন্যকারুকে সাক্ষী রেখে প্রমাণ করাতে হবে। কিন্তু সে যে সে-ই, তার প্রমাণ কে দেবে ? আমি যদি আমার বন্ধু ত্রিলোচনকে সাক্ষী হিসাবে আনি, তবে সেই সাক্ষী ত্রিলোচন যে সত্যিই ত্রিলোচন, তার প্রমাণ দেবার জন্য কি পঞ্চাননকে আনতে হবে ? আবার পঞ্চানন যে সত্যিই পঞ্চানন তা প্রমাণ করার জন্য—

আমি আমার এ সন্দেহের কথা জানালুম।

গম্‌গমে বাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, তাহলে, আপনার পাশপোর্ট আছে ? চিরকাল কলকাতা শহরেই আছি, কখনো ঘাটশিলা কিংবা ডুমকায় বেড়াতে গেছি, ওর জন্য পাশপোর্ট তো লাগেনি। বাঙালও নই যে কখনো ঢ্যাশে যাবার জন্য পাশপোর্টের দরকার হবে। আর বিলেত আমেরিকায় যদি কখনো যেতুম, তবে কি এই সামান্য হাতের ময়লা একশো টাকা ভাঙাবার জন্যে নিজে ব্যাঙ্কে আসতুম ! তবে তো, আর্দালি বেয়ারা পাঠিয়েই—।

তাহলে ?

—তাহলে, এই ব্যাঙ্কেই অ্যাকাউন্ট আছে—এমন কারুকে যোগাড় করুন। এসব কথা শুনলে রাগ হয় কি না ?

তখন ইচ্ছে হয় না, যে লোক আমাকে ঐ চেকটা দিয়েছে, তার সঙ্গে ঝগড়া করি ? কিংবা ব্যাঙ্কে ঐ ডিগবাজি খেতে সুরু করি, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের মতন আঙুলের মুদ্রায় দুহাত তুলে নাচতে বলি, মাটি টাকা, টাকা মাটি, মাটি টাকা ?

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে যেহেতু আমার কয়েক লক্ষ মাইল

তফাৎ, তাই ঐ একশোটি টাকার লোভও আমার পক্ষে ছাড়া সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে এমন লোকের জন্য আমি খোঁজা-খুঁজি শুরু করি। খবরের কাগজে যে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখেছি মাত্র পাঁচ টাকা দিয়েই নাকি যে-কোনো সময়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে, বুঝলুম সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। চাষাভূষো, কুলি-মজুর কিংবা আমার মত বেকাররা ইচ্ছে করলেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না, আগে থেকেই অ্যাকাউন্টধারী সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে যাদের আলাপ পরিচয় নেই, তাদের টাকা জমাবার অধিকারও নেই। যাই হোক, বহু খোঁজাখুঁজি করে আমি একজন এরকম অল্প চেনা লোকের সন্ধান পেলুম ও অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাঁকে দিয়ে আমার আমিত্ব সম্পর্কে সাক্ষী দেওয়ালুম।

অ্যাকাউন্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে সব টাকাটা যদি তুলে নিতাম আবার, তাহলে আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকতো না। কিন্তু, মানুষের তো লোভের শেষ নেই। আমার ইচ্ছে হলো, পঞ্চাশটা টাকা জমা রেখে দি। আবার যদি কখনো বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ে কোনো ক্রশড্ চেক পেয়ে যাই, তাহলে আবার অ্যাকাউন্ট খোলার ঝামেলা সহ্য করতে হবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রাখাই তো সম্ভ্রান্ত হবার লক্ষণ, সুতরাং এই সুযোগে একটু সম্ভ্রান্ত হওয়া যাক্ না! এই লোভের ফলেই আমার বিপদের পর বিপদ শুরু হলো।

প্রথম বিপদ, সই মেলানো। পরের বার টাকা তুলতে গিয়ে বেশ মেজাজে চেক সই করে, জমা দিয়ে পেতলের চাকতিটা হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ক্যাশ কাউন্টারে অপেক্ষা করছি, পকেটে পয়সা নেই বলে শীত শীত করছিল, মনকে প্রবোধ দিয়েছি—এক্ষুণি গুপ্তধন পেয়ে যাবো, এমন সময় হিন্দুস্থানী বেয়ারা আমার নম্বর ধরে হাঁক দিয়ে জানালো, আমাকে সাহেব ডাকছেন। এত লোকের মধ্যে আমাকেই কেন শুধু সাহেব ডাকছেন? আরও শীত করতে লাগলো, তবু ভয়ে ভয়ে গেলাম। সাহেব কুটিলচোখে আপাদ মস্তক

আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, এ সই কার? আমি বিনীতভাবে বললুম, আজ্ঞে, আমার হাতের লেখাটা একটু খারাপ বটে, পড়তে হয়তো অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু ওটা আমারই লেখা।

—ঠিক তো? সাহেবের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

সাহেবের টেবিলের উল্টো দিকে দুতিনটে খালি চেয়ার, কিন্তু সাহেব আমাকে বসতে বলেনি। তা বলবেনই বা কেন, সাহেবের মুখ এখন বিচারকের মতন, আমি দাঁড়িয়ে আছি আসামী হয়ে, বিচারকের সামনে আসামীর বসার কি অধিকার? আমার পক্ষে এখন আবার কোনো সাক্ষীও নেই। তবু যতদূর সম্ভব দৃঢ়ভাবে বললুম, হ্যাঁ ওটা আমারই লেখা। সাহেব ভুরু কুঁচকে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, আর একটা সই করুন। করলুম। সাহেব বললেন. উহুঁ হোলো না। আরেকটা। উহুঁ, আর একটা। করলুম।

সাহেব এবার বেশ বিরক্তভাবে বললেন, এর কোনো মানে হয়? কোনোটার সঙ্গেই কোনোটার মিল নেই। চারটে লেখাই একদম আলাদা।

আমি এবার হেসে ফেলে গোপন অহংকারের সঙ্গে জানালুম, তা ঠিক বলেছেন। আমি একরকম লেখা দু'বার লিখি এ দোষ কেউ আমায় দিতে পারবে না। আমার প্রত্যেকটা লেখাই নতুন ধরণের। আপনি দেখবেন?

—নিজের নামটা সবাই সবসময় একরকম লেখে।

—সবাইর কথা জানিনা। একরকম একঘেয়ে ভাবে কোনো জিনিসই আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। নিজের নামও নয়।

পাগল প্রমাণিত হলে আসামী যেরকম বেকসুর খালাস পায়, অনেকটা যেন সেইরকমই কোনো কারণে, সাহেব আমাকে গভীর দয়া করে বললেন, আচ্ছা যান্, এবার ছেড়ে দিলুম। পরের বার কিন্তু—

আমি বললুম, পরের বারও আপনি ছাড়তে বাধ্য হবেন। পরের

বার আমি ধুতির বদলে স্যুট এবং টাই পরে আসবো, তখন দেখবো আপনি কি রকম না ছেড়ে পারেন।

আমি কথা রেখেছিলাম, তারপরও প্রত্যেকবার আমার সই নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে। কয়েকবার গণ্ডগোল হবার পর ব্যাঙ্কের লোকেরা আমায় চিনে গেল। আমায় দেখলেই তারা বলে, ঐ সেই সই-মেলেনা লোকটা এসেছে। সুতরাং আমার আর অসুবিধে হয় না। সাময়িকভাবে, এই সময়টুকু আমার সুখের কাল। ব্যাঙ্কে যাতায়াত করাটা আমার পক্ষে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সই করলেই টাকা পাওয়া যায়—এটা আমার কাছে একটা নতুন খেলা। যখন তখন পাঁচ দশ টাকা পেলেই আমি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসি, আবার দুদিন বাদেই তুলে আনি। এক একদিন এমন হয়েছে, কোনো জায়গা থেকে গোটা কুড়ি টাকা পেলে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে সেটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি, জমা দেবার পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে, পকেটে তো আর একটাও পয়সা রইলো না। তক্ষুনি ফিরে গিয়ে আবার তার থেকে পনেরো টাকা তুলে ফেলেছি—তোলার পরই আবার মনে হয়েছে—পুরো পনেরো টাকাই খরচ করার তো মানে হয় না। সুতরাং তার থেকে পাঁচ টাকা আবার জমা দিয়ে এসেছি। দুপুরের দিকে বন্ধু-বান্ধবরা যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস? আমি গম্ভীরভাবে বলি এই ব্যাঙ্কে যাচ্ছি! বন্ধু-বান্ধবরা শ্রদ্ধা মিলিত অবাক চোখে আমার দিকে তাকায়। মোট কথা, যাকে বলে ব্যাঙ্কিং হ্যাবিট, আমার সেটা বেশ পাকা হয়ে উঠলো।

এর ফলে, ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আমার একটা ধারণা গড়ে ওঠে। পরোপকারের জন্য, সেটা অন্যদেরও জানানো দরকার।

যে কোনো ব্যাঙ্কে গেলেই দেখা যায়, পঞ্চাশ কি শ-খানেক পরিচ্ছন্ন ও সুবেশ (অনেকেই স্যুট টাই পরা) লোক মহাব্যস্ত হয়ে কাজ কর্ম করছে। এখন প্রশ্ন এই, এরা কি সবাই নিস্বার্থ সমাজ সেবক? নইলে, আমার আপনার জন্য এত খাটাখাটি করে ওদের

নিজেদের কি লাভ? টাকা পকেটে রাখলে খরচ হয়ে যায়, বাড়িতে রাখলে চুরি ডাকাতি হবার সম্ভাবনা। ব্যাঙ্কে টাকা দিলেই একেবারে নিরাপদ। কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জন্য কোনো ভাড়া লাগে না, সহজে তোলা পর্যন্ত যায় না, এমন কি কষ্টে সৃষ্টে এক বছর রাখতে পারলে—টাকা ডিম পেড়ে বেড়ে পর্যন্ত যায়, এ এক আজব রহস্য। কেনই বা ওরা জমা করছে, কেনই বা ওরা টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এর কোনো উত্তর খুঁজে পাই না আমি। কেউ কেউ বলেন, এর সঙ্গে নাকি অর্থনীতির গভীর সম্পর্ক আছে। ব্যাঙ্ক-এর প্রসারের মধ্যেই নাকি দেশের উন্নতির মূল সূত্র! এসব একেবারে গুজব। এসব ভালো ভালো কথা শুধু ব্যাঙ্কের ঐ নিরীহ কর্মচারীদের ভোলাবার জন্য। কিন্তু ঐসব ভালো ভালো পোশাক পরা বুদ্ধিমান লোকেরা কি সহজে ভোলে, এসব কথা যে গাঁজাখুরি তা ওঁরা এতদিনে জেনে গিয়েছেন। যে কোনো ব্যাঙ্কে গেলেই তা বোঝা যায় ওরা যে দায়ে পড়ে পরোপকার করেছেন তার ছাপ ওঁদের চোখে মুখে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ক্যাশকাউন্টারে যাঁরা বসেন, তাঁরা সাধারণত বেশ হাসি খুশী ধরণের লোক। বারবার করে টাকা গুণছেন, হাসতে হাসতে লোকের হাতে তুলে দিচ্ছেন। যত বেশী টাকা দিতে হয়, ততই আনন্দ। ভাবখানা এই, নাও, খরচ করো, ওড়াও! ফুরিয়ে ফেলো। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ফেলো সব টাকা যাতে এখানে আর আসতে না হয়! আর যাঁরা রিসিভিং কার্ড জমার টাকা বা চেক্ নেন, তাদের মুখগুলো ততই গম্ভীর! কেউ টাকা জমা দিতে গেলে, গম্ভীর বিরক্তি-পূর্ণ চোখ তুলে তাকান। ভাবখানা এই, আবার টাকা জমা দিতে এসেছো? পাজী কোথাকার। টাকা নিজের কাছে রাখলে কুটকুট করে নাকি? শুধু শুধু আমাদের দিয়ে ভূতের বেগার খাটানো! আচ্ছা দাঁড়াও না, এরপর যখন টাকা তুলতে আসবে তখন এত দেরী করবো যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার শখ তোমার সেদিন ঘুচে যাবে।

মোট কথা, গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে চুপি চুপি একদিন সব ব্যাঙ্কগুলোকে বন্ধ করে দেবার জন্য একটা গোপন চেষ্টা চলছে। সেইজন্যই লোককে ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে নিরুৎসাহ করার সবরকম চেষ্টা চলছে। সেই জন্যই অত সব জটিল নিয়ম কানুন, লোককে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে জব্দ করার চেষ্টা, সই মেলানো নিয়ে খিটিমিটি। সবগুলোরই উদ্দেশ্য এক। তবু যদি লোকে নাছোড়বান্দা হয়, তাই ব্যাঙ্ক বন্ধও হয় তাড়াতাড়ি। সব অফিস দশটা থেকে পাঁচটা, ব্যাঙ্কই শুধু দুটো পর্যন্ত খোলা, দুটোর পর থেকে বাকি তিন ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে পরামর্শ হয় পরদিন আরও কি কি উপায়ে লোক তাড়ানো হবে। ব্যাঙ্কে সময়ের বড় কড়াকড়ি।

হ্যাঁ, সেই সময়ের কথা বলার জন্যই তো এ লেখার সূত্রপাত। গোপনে কি ভাবে যেন আবার ব্যাঙ্কে একশোটা টাকা জমে গেল, এবং সেটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গেলাম। তারপর একদিন, সেদিন মাসের উনত্রিশ তারিখ, আমাদের পাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলা আমার মায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়লেন। বললেন, দিদি, আমাকে বাঁচান, আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিন। ভদ্রমহিলার স্বামীর অসুখ কয়েকদিন ধরে, আজ সকালবেলা অবস্থা গুরুতর হয়েছে, পাড়ার ডাক্তার এসে চলে গেছেন, যে তাঁর আর কিছু করার সাধ্য নেই, বড় ডাক্তার এনে দেখাতে হবে। বড় ডাক্তারের ফি, ওষুধপত্র অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা ভদ্রমহিলার চাই-ই। দরকার হলে তাঁর সোনার বালাটা বন্ধক রেখে—

আমি পাশের ঘরে ছিলাম। মা এসে বললেন, মেয়েটা সত্যিই দারুণ বিপদে পড়েছে। এখন কি করি বলতো? টাকা তো একদম নেই—

তখনই আমার মনে পড়লো, আমার তো সেই কয়েকখানা বাজে, ময়লা, স্যাঁতসেতে শেট ব্যাঙ্কের অন্ধকার সিন্দুকে অকারণে পচে নষ্ট হচ্ছে। কোনো কাজেই লাগছে না। আমি তখুনি বললুম,

তুমি ভদ্রমহিলাকে বলো, ডাক্তারকে খবর দিতে, ডাক্তার আসার মধ্যেই আমি টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসছি। আমার ঘণ্টা খানেক লাগবে।

পাঁচটা টাকা ছিল, তাই নিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে আমি তখুনি বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাস পেয়ে গেলুম ভাগ্যবলে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই বাস বন্ধ, সামনে ছাত্র শোভাযাত্রা, ছাত্ররা গোটা রাস্তা আটকে দিয়েছে। দেরী হলে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে নেমে ট্যাক্সির জন্য খোঁজাখুঁজি করতে লাগলুম। খানিকটা বাদে ট্যাক্সী পাওয়া গেল, আমি চেঁচিয়ে বললুম চলুন ডালহৌসি, জল্‌দি!

বেন্টিক ষ্ট্রীটে এসে আবার ট্রাফিক জ্যাম। শুনলুম সামনেই কোন একটি ব্যাঙ্কে আগুন লেগেছে। আমি আঁৎকে উঠলুম, কোন ব্যাঙ্ক। আমার ব্যাঙ্ক নয়তো? উঁকি মেরে জেনে নিশ্চিন্ত হলুম, অন্য ব্যাঙ্ক। কিন্তু তখন সামনে পেছনে এমন জ্যাম যে ট্যাক্সির বেরুবার কোনো উপায় নেই। ছাত্র আন্দোলন সামলাতে সমস্ত পুলিশ নিয়োজিত হয়েছে বলে, এখানে ট্রাফিক সামলাতেও কোনো পুলিশ নেই। এদিকে তুটো বাজতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে ছুটতে যখন ব্যাঙ্কের সামনে পৌঁছোলুম তখন আর মাত্র পাঁচমিনিট বাকি। যাক। রাস্তার ওপর থেকে দেখি, ব্যাঙ্কের গেট টেনে বন্ধ করা। কয়েকজন লোক সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুস্থানী পাগড়ি পরা দরোয়ান বলছে, হবে না, হবে না। আর একজন ফর্সা, সাহেবী পোষাক পরা প্রৌঢ় ভিতর থেকে বলছে, গেট আউট, গেটআউট! ডোণ্ট ডিস্টার্ব!

আমি ভাবলুম, আহা, ঐ লোকগুলোর বোধহয় আগে ব্যাঙ্কে টাকা ছিল, এখন সব ফুরিয়ে ভিখিরি হয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কেই এসেছে ভিক্ষে চাইতে। কাছে গিয়ে দেখলুম, তা নয়, লোকগুলোর সবারই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাঙ্ক নাকি বন্ধ হয়ে গেছে তাই ওদের আর

ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাই গেট আউট। শুনেই আমার রক্ত গরম হয়ে উঠলো, আমি বললুম মোটেই এখনো দুটো বাজেনি। ফর্সা প্রৌঢ় রুক্ষ গলায় ইংরাজিতে বললেন, হ্যাঁ দুটো বেজে গেছে। অথচ বাইরে উপস্থিত চারজনের হাতের ঘড়িতে তখন দুটো বাজেনি। আমি ব্যাকুল ভাবে বললুম, যদি দুটো বাজেও, তবু আমায় ভেতরে ঢুকতে দাও। আমার বিশেষ দরকার।

সাহেব বললেন, সবারই বিশেষ দরকার শুনছি। ওসব হবে না। দারোয়ান গেট বন্ধ করে দাও। আমি অসহায়ের মতন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলুম। হঠাৎ চোখ পড়লো রাস্তার ওপারে একটি গীর্জা, সেই গীর্জার চূড়ায় এক জ্ঞানবৃদ্ধ ঘড়ি। আমি চেঁচিয়ে বললুম, ঐ দ্যাখো, গীর্জার ঘড়িতে এখনো দুটো বাজেনি। সাহেব বললেন, ওসব জানি না, আমাদের ঘড়িতে অনেকক্ষণ দুটো বেজে গেছে। এমন সময় আমাদের কথা থামিয়ে দিয়ে গীর্জার ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি শুরু হলো, ঘোষণার মতন সুললিত গম্ভীর ভাবে দু'বার বাজলো। আমি বললুম, তুমি শুধু শুধু অন্যায়ভাবে আমাকে আটকে রাখছো কেন? সাহেব বললেন, গীর্জার ঘড়ি যদি ভুল হয় তবে সব দোষ কি আমার?

আমি রাগের মাথায় একটা কঠিন গালাগালি উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলুম। তারপর সেটা চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলুম, না, দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়। সব দোষ ঐ গীর্জার ঘড়ির ওপর চাপানোই ভালো। দোষ ঐ ঘড়ির, সব দোষ সময়ের।

॥ ২৩ ॥

'মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। কিছুদিন আগে একটা ইংরেজি রসিকতাও শুনেছিলাম। অনেকটা এইরকম। একটি ছেলে মেয়েকে বলছে, তোমাকে না পেলে আমি নির্ঘাৎ মরে যাবো। এক লক্ষ বার মরে যাবো! বাংলাতে এরকম রসিকতা আছে, একজন একটি মেয়েকে বলছে, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো—তা হলে আমি বাঁচবো না। অন্তত আর ৫০ বছরের বেশী কিছুতেই বাঁচবো না। কবি দান্তে-বিয়াত্রিচের প্রেমে উন্মাদ প্রায় হয়েছিলেন, সারাজীবন তিনি ঐ রমণীকে ভুলতে পারেন নি—তা সত্বেও অবশ্য অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে প্রেম করতে তাঁর আটকায় নি। বিবাহ এবং প্রায় আধ ডজন সন্তানাদিও হয়েছিল তাঁর।

কিছু কিছু মানুষ জীবনে একবারই মাত্র প্রেমে পড়ে, অনেকে ঘনঘন প্রেমে পড়ে—(আবার অনেক মানুষ অবশ্য একবার প্রেমে পড়ে না সারাজীবনে, ও জিনিসটার স্বাদই পায় না—এমন মানুষ আমি স্বচক্ষেই দেখেছি)। আমি ঘনঘন প্রেমে পড়া মানুষের দলে। ট্রেনের জানলায় বসে প্ল্যাটফর্মে পায়চারিতা কোনো রূপসীকে দেখলেও আমি প্রেমে পড়ে যাই। এমনকি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে কোনো মোটর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানলায় বসা কোনো তরুণীকে দেখেও আমি অনেক সময় এমন প্রেমে পড়ে যাই যে তারপর সাত-আট দিন আমার আর আহার নিদ্রায় রুচি থাকে না, আমার মন উদাস হয়ে যায়, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ে—খাঁটি ব্যর্থ প্রেমিকের সব লক্ষণ আমার মধ্যে ফুটে ওঠে। অনেকে হয়তো বলবেন, একে প্রেম বলে না, এসব শুধু ক্ষণিকের রূপজ মোহ কিংবা দৃষ্টি বিভ্রম। কিন্তু কোন প্রেমটা খাঁটি আর কোনটা মোহ কিংবা

ছলনা—তা যাচাই করার মতন কোনো কষ্টিপাথর তো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। মিথ্যে কথা ধরে ফেলার জন্য 'লাইডিটেক্টর' যন্ত্র আছে, কিন্তু লাভডিটেক্টরের কথা এখনো শোনা যায় নি। একনিষ্ঠ প্রেম যেমন গভীর হতে পারে, তেমনি, কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা প্রেমও আন্তরিক ও গভীর হতে কোনো বাধা নেই। গ্যেটেও বলেছেন, প্রেমের আন্তরিকতা কিংবা দীর্ঘস্থায়িত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলো না, শুধু ছাখো, সেই মুহূর্তে সেটা সত্য কি না।

আমি নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলি। পথে-ঘাটে অনেক সময় কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখে আমাদের চোখ আটকে যায়। আমরা তার দিকে বারবার তাকাই, বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকলে তার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করি, মোটামুটি ভদ্রতা বজায় রেখে যতটা দেখা সম্ভব দেখে নিই—মেয়েরাও তাতে খুশি হয়। বলাই বাহুল্য, একে আমি প্রেম বলতে চাইছি না। এইসব মেয়েদের মুখ আমাদের বেশীক্ষণ মনে থাকে না—সেইদিনই হয়তো আবার আর একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে আগের জনের কথা আমরা ভুলে যাই। তিনদিন বা এক সপ্তাহ বাদেও এরকম পথে দেখা কোনো মেয়ের মুখ মনে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যদি না সেই মেয়ে রূপসী তিলোত্তমা হয়—কিন্তু সেরকম মেয়েকে পথে ঘাটে দেখা যাবেই বা কেন—অন্তত আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। মেয়েরা বরং এসব ব্যাপার বেশী মনে রাখে। নেমতন্তন্ন-বাড়িতে কত ভালো ভালো সাজপোষাক পরা মেয়েদের আমরা দেখতে পাই—তাদের প্রায় কারুরই কথা পরে মনে থাকে না—যদি না আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু মেয়েরা মনে রাখে, ছ'মাস আগেকার কোনো নেমন্তন্নবাড়িতে দেখা পুরুষ সম্বন্ধে কথা উঠলেই তারা বলতে পারে—কোন লোকটা? ঐ নীল রঙের স্যুট পরা যে-ভদ্রলোক নাইলন জর্জেট শাড়ি পরা একটা মেয়ের সঙ্গে খুব গল্প করছিল, সে?

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীট আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে একজন মহিলাকে দেখে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। হঠাৎ আমার

মনে হলো, মহিলাকে আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি! কিন্তু কোথায়? আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কি? একবার পরিচয় হলে—সেই রমণীর মুখ আমি কখনো ভুলি না। তা ছাড়া, মহিলার সঙ্গে একবার আমার চোখাচোখি হলো—তিনি পরিচয়ের কোনো চিহ্ন দেখালেন না।

আমি বসেছিলাম একটা একতলা বাসের জানালায়। কি একটা ছোটোখাটো ট্র্যাফিক জ্যামে বাসটা দাঁড়িয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তেই চলবে। মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিলেন ফুটপাথে, হাতে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট।

সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে মহিলাটিকে খুব রূপসী নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু আমার চোখে তাঁকে অপূর্ব রূপবতী মনে হলো। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় তিনি একটু বেশী লম্বা, বয়েস অন্তত ছাব্বিশ সাতাশ, শরীরটা খুবই সুগঠিত, তার শরীরে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন এক বিন্দুও কম বেশী নয়—ঠিক যে-টুকু হলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তবে স্তন দুটি সামান্য একটু বেশী বড়—কিন্তু তাদের গড়ন এমন নিখুঁত ও উন্নত যে তাতে সৌন্দর্য একটুও চিড় খায় নি। রং ফর্সা নয়, শ্যামাই বলা যায় তাঁকে, চোখ দুটো খুব টান টান, বড় বড় চোখের পাতা। মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন সোজা হয়ে, তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কোন ন্যাকামি গুমোর নেই—স্বাভাবিক স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। যে-সব মেয়ে পল্লবিনী লতার মতন অন্য কারুকে আশ্রয় না করে বাঁচতে পারে না—তাদের সঙ্গে একটুও মিল নেই মহিলাটির, অথচ কোনো পুরুষালি ভাবও নেই, কোনো কঠোরতা নেই। রাস্তায় মেয়েরা একা থাকলে সাধারণতঃ মুখখানা গোমড়া করে রাখে অথচ ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকিয়ে চাঞ্চল্য দেখায়—এই মহিলা অন্য রকম।

কিন্তু রূপসী হলেও মেয়েটি এমন কিছু অসাধারণ নয়—বিশেষত আমার বাসের সামনেই সিটে একটি ফর্সা ও বেশ রূপসী কমবয়েসী মেয়ে বসে আছে—কিন্তু তার দিক থেকেও চোখ ফিরিয়ে আমি

পথের ঐ মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। খালি মনে হচ্ছে, এঁকে আমি আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়? যত চেনা শুনো বাড়ি, বন্ধুর বোন বা পরিচিত ব্যক্তিদের স্ত্রী ও শ্যালিকাদের মুখ মনে করলুম—না, ভদ্রমহিলাকে সেরকম কোথাও আমি দেখিনি। আমার সঙ্গে কখনো পরিচয় নিশ্চয় হয় নি। তা হলে কোথায়? কোনো ছবিতে? মহিলা কি বিখ্যাত কেউ? কোনো সিনেমা স্টার হতেই পারে না—তা হলে রাস্তা ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে যেত! কোনো গায়িকা? তাও হতে পারে না—গান শোনার কথা মনে নেই—চেহারা মনে আছে—এটা প্রায় অসম্ভব। গায়িকাদের মধ্যে সুন্দরী যে-কজন মাত্র আছেন তাদের চেহারা ও নাম একসঙ্গেই আমার মনে আছে। তারপরই আমার মনে পড়ল, আমার ঘরে কোণারকের সুর সুন্দরী মূর্তির একটা ছবি বাঁধানো আছে—তার সঙ্গেই কি ভদ্রমহিলার চেহারার খুব মিল নয়? বিশেষত দাঁড়াবার ভঙ্গি, উন্নত স্তন, ও স্ফুরিত অধর!

কিন্তু পাথরের মূর্তির সঙ্গে জ্যান্ত মানুষের এ রকম চেহারার মিল কখনো হতে পারে না—তা ছাড়া আমিও এত বেশী রোমান্টিক নই যে কলকাতায় রাস্তায় কোনো মেয়েকে দেখে আমার বিখ্যাত ভাস্কর্যের কথা মনে পড়বে। কোণারকের মূর্তিটা তৈরী হয়েছিল অন্ততঃ আট ন'শো বছর আগে—রোদ্দুরে হাওয়ায় সেগুলো অনেক ক্ষয়ে গেছে—রেখাগুলো তেমন সুক্ষ্ম আর নেই—শুধু মুখের রহস্যময় হাসিটি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। এই মহিলা তো হাসছেন না—এঁর চেহারা যে-কোনো ভাস্করের মডেল হবার পক্ষে অনবদ্য ঠিকই—কিন্তু···। অথচ, আর কোথাও বা এঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

ট্র্যাফিক জ্যাম কেটে গেছে, বাস আবার স্টার্ট নিয়েছে, কিন্তু ঐ মহিলাকে আরও একটুক্ষণ দেখার জন্য দুরন্ত ইচ্ছে জাগলো আমার। সেই মুহূর্তে মনে হলো, পৃথিবীতে এর থেকে বড় কাজ আর কিছু নেই। চলন্ত বাসে থেকে আমি ঝুপ করে নেমে পড়লাম।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই মুহূর্তেই একটা ট্যাক্সি ডেকে মহিলাটি উঠে পড়লেন, ট্যাক্সি হুস করে চলে গেল। মহিলাটি ট্যাক্সির জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। একথাও ঠিক মহিলাটি আমাকে লক্ষ্যই করেন নি। আমি তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম কিংবা তাঁকে দেখার জন্যই বাস থেকে নেমেছিলাম—সে কথা তিনি টেরও পান নি।

বাড়িতে এসেই কোণারকের সুর সুন্দরীর মূর্তির ছবিটা আমি দেয়াল থেকে নামিয়ে ভালো করে দেখলাম। ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা সাধারণ মিল কল্পনা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু এমন কিছু হুবহু মিল নেই যে তাঁকে দেখে সবারই এই মূর্তির কথা মনে পড়বে। মধ্যযুগের কোনো শিল্পির কল্পনা এই বিংশ শতাব্দীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—সে রকম কোনো ছেলেমানুষী চিন্তার অবকাশ নেই। তবু মহিলাকে দেখে আমার ঐ মূর্তির কথাই মনে পড়েছিল।

সেই ঘটনার পর চার বছর কেটে গেছে। সেই মহিলার মুখ, দাঁড়াবার ভঙ্গি, সম্পূর্ণ চেহারা, এমনকি তাঁর ঘড়ির ব্যাণ্ড যে সাদা ছিল—এবং পায়ে ছিল সাদা রঙের চটি—তার কিছুই ভুলিনি। এখনো, আজ এই লিখতে বসেও মহিলার মুখ আমার মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। সেদিনের পর আমি সারা কলকাতার রাস্তায় মহিলাকে আবার খুঁজেছি, আমহার্স্ট স্ট্রিট বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি—কিন্তু ওঁকে সেখানে আর দেখিনি কোনোদিন। মাঝে মাঝেই সেই মহিলার কথা আমার মনে পড়ে, মনে পড়লেই বুকের মধ্যে একটা দারুন কষ্ট হয়—কোণারকের সুর সুন্দরী মূর্তির ছবির দিকে তাকাই—মনে হয়, ঐ মহিলার সঙ্গে একবার একটা কথা বলতে পারলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যেতো!

এরপরে আবার অন্য মেয়েদের রূপ আমাকে আকর্ষণ করেছে। পরিচয় হয়েছে অনেকের সঙ্গে, কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে,

কোনো বিশেষ মেয়ের জন্য হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে—তার সামান্য মন খারাপ কিংবা হাসিতে আমি শোক কিংবা সুখ পেয়েছি—তবু সেই দু'এক মিনিটের জন্য মহিলার কথা মনে পড়লেই আমার বুক টন্‌টন্‌ করে।

ভদ্রমহিলাকে আমি আর একবার মাত্র দেখেছিলাম দু'এক পলকের জন্য। প্রথম দেখার তিন বছর পরে। একটা সিনেমা হলের মধ্যে শো শেষ হয়েছে, আমি মেট্রোসিনেমার সিঁড়ি দিয়ে নামছি—সিঁড়ির ঠিক নিচে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে সেই মহিলা। চিনতে আমার এক মুহূর্তের জন্যও ভুল হলো না--সেদিন মহিলা অনেক বেশী সাজ পোশাক পরেছেন—তবুও কোণারকের মূর্তির কথাই মনে পড়লো আমার। সেদিন যেন আরও বেশী মিল দেখতে পেলাম। মেট্রো সিনেমার যে-কোনো শো-তে সুদর্শনা নারীর অভাব হয় না। তবুও আমার মনে হলো, সবার থেকে আলাদা হয়ে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে চলেছেন ঐ একজন। প্রতি পদক্ষেপে অপূর্ব রূপের মাধুরী। এই রূপকে বলা যায় ওজস্বিনী রূপ। আমার তীব্র ইচ্ছে হল, মহিলার পাশে যাই—কথা বলার কোনো সুযোগ পাবো না, কিন্তু সামান্য একটুও স্পর্শ যদি পাই, হাতের একটু ছোঁয়া, অথবা চুলের গন্ধ, তাহলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

সে সুযোগও পাইনি। অত ভিড়ের মধ্যে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া কত শক্ত। তবু লোকজনকে ঠেলাঠেলি করে আমি যখন নিচে পৌঁছোলাম—তখন দেখি বাইরে অপেক্ষামান গাড়িতে একজন যুবা পুরুষ মহিলাটির জন্য দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে, মহিলাটি নিচু হয়ে গাড়িতে ঢুকছেন। সেদিন আমি সেই যুবকটির প্রতি যে তীব্র ঈর্ষা বোধ করেছিলাম—কোনো প্রেমিক কখনো অত ভয়ংকর ঈর্ষায় জর্জরিত হয় কিনা জানি না!

॥ ২৪ ॥

দু'জনকেই চিনি আগে থেকে। সুতপা পড়তো আমার মাসতুতো বোনের সঙ্গে, সেই সময় আমাদের বাড়িতে দেখেছি কয়েকবার। আর প্রিয়তোষ ছিল দুর্গাপুরে আমার বন্ধুর সহকর্মী। একবার দুর্গাপুরে অরুণাভর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেই সময় প্রিয়তোষের সঙ্গে আলাপ। অনেক সময় দু'তিনদিনের পরিচয়েই কারুর কারুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। তখন প্রিয়তোষের বিয়ে হয় নি।

তারপর প্রিয়তোষ বদলি হয়ে এলো কলকাতায়। সুতপার সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হয়, তখন আমি অবশ্য কলকাতায় ছিলাম না। ইতিমধ্যে অরুণাভ চলে গেল হাঙ্গেরিতে। আর আমার মাসতুতো বোন টুপ করে মরে গেল। কিন্তু বন্ধুর বন্ধু আর মাসতুতো বোনের বান্ধবী প্রিয়তোষ আর সুতপার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

বেশ ছিমছাম সংসার ওদের। আড়াইখানা ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাট। আত্মীয় স্বজনের ঝামেলা নেই। সুতপা ঘরদোর খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে জানে। কোনো কোনো সন্ধ্যেবেলা ওদের বাড়িতে একটা বেশ ঘরোয়া আড্ডার পরিবেশ হয়, সেই লোভে আমি মাঝে মাঝে যাই। প্রিয়তোষ হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যারা অফিস ছুটির পরেও অফিসের গল্প বলতে ভালোবাসে না। আর সুতপাও শাড়ী গয়না হিন্দী সিনেমা ছাড়াও অন্য বিষয়ে কথা বলতে জানে।

ওদের দেখে আমার মনে হতো একটি আদর্শ দম্পতি। ওরা সুখী এবং সেই সুখ নিয়েও বাড়াবাড়ি করে না। লোককে দেখিয়ে বেড়ায় না। ওদের কৌতুকবোধ আছে।

মানুষের জানা কত ভুল হয়। আমি ওদের একটুও বুঝতে পারিনি। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে ওদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

মাস তিনেকের জন্য একটা কাজের উপলক্ষে আমাকে ভারতের বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে আসার পর দেখলাম, কলকাতায় বেশ কয়েকটা পরিবর্তন হয়ে গেল, তার মধ্যে অন্যতম, সুতপা আর প্রিয়তোষের বিচ্ছেদ। হঠাৎ একদিন ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি, সেটা দারুণ অগোছালো, প্রিয়তোষ যেন রাগের চোটে সুতপার হাতের সব চিহ্নও মুছে ফেলতে চায়। আমরা এখন যে সভ্যতায় অভ্যস্ত, তাতে খুব বেশী বন্ধুত্ব না থাকলে আমরা কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করি না।

আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, সুতপা কোথায়? বাপের বাড়িতে গেছে?

প্রিয়তোষ শুকনো হেসে বলেছিল, না। ওর বাপের বাড়ি নেই। আপাতত গেছে মামার বাড়িতে। তবে এখানে আর ফিরবে না। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

এরপর আর দুটো একটা কথা বলেই আমি চুপ করে গেলাম। কেন বিচ্ছেদ হয়েছে, জানতে চাইলাম না।

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় পরিতোষ প্রথম দিকে খুব মদ ধরলো। ওর বাড়িতে দু'একবার গিয়ে দেখলাম। খুব মাতালের আড্ডা জমেছে। বছর খানেকের মধ্যেই অবশ্য মদ একেবারে ছেড়ে দিল। তার বদলে ওর মুখে শোনা যেতে লাগলো গরম গরম কথা। আগে ওর কাছে কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা শুনিনি, কিন্তু এবারে ওকে দেখলাম উগ্র রাজনীতির গোঁড়া সমর্থক। পৃথিবীর সব কিছুর ওপরেই একটা ঘৃণার ভাব।

সুতপার সঙ্গেও একদিন দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। ঠিক আগেরই মতন সাজ-পোশাক। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললো, ভালো আছেন?

মিনিট সাতেক কথা বললাম রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে। একবারও প্রিয়তোষের নাম উচ্চারণ করলাম না আমরা কেউ। সুতপা আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে লাগলো যেন একটা চ্যালেঞ্জ, যেন

সে বলতে চায়, আমি কোনো দোষ করিনি। আমার বুকের মধ্যে ছটফট করছিল একটাই প্রশ্ন, কেন? কেন? কেন তোমাদের সুখের সংসার ভেঙে গেল? কিন্তু ভদ্রতাবোধে মুখ উচ্চারণ করিনি।

বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও বিয়ে ভাঙা সহজ নয়। তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়। এই তিন বছরের মধ্যে ওরা আর বিয়ে করতে পারবে না। তাছাড়া আছে খোরপোষের প্রশ্ন। এই নিয়ে আদালতে মামলা হয়।

একদিন অন্য একজন বন্ধু বললো, আজ প্রিয়তোষের ডিভোর্সের মামলা ছিল, সাক্ষী দিতে গিয়েছিলাম।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো? কি হলো সেখানে?

বন্ধুটি বললো, সুতপা খুব জেদী মেয়ে। সহজে ডিভোর্স দেবে না। খুব ভোগাবে মনে হচ্ছে।

আমি ওর কাছ থেকে জেরা করে কয়েকটা খবর জেনে নিলাম। বিচ্ছেদের আসল কারণটা সেও জানে না। এর মধ্যে তৃতীয় কোনো নারী বা পুরুষ নেই। ওদের নাকি মনের মিল হয়নি।

আমার মনের মধ্যে একটা পোকার মতন কুরেকুরে চিন্তা ঘুরে বেড়ায়। সেটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি। বারবার বলি, এটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার, এ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কি আছে! ওরা ওদের ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবে।

তবু, মনের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায়, সুখ কাকে বলে? বাইরের থেকে দেখে আমার তো মনে হয়েছিল, প্রিয়তোষ আর সুতপা যথার্থ সুখী। অথচ ওদের মনের মিল হয় নি! তাহলে চোখের সামনে অন্য যত সুখের ছবি দেখেছি, সবই কি আসলে অলীক? ওদের সেই শান্তির সংসারটার কথা ভেবে আমার দারুণ মন খারাপ লাগে।

॥ ২৫ ॥

আমি একদিন দু'তিন মিনিটের জন্য চোর হয়েছিলাম। গোছা গোছা টাকা চুরির জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম আমি। পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশাটির মূল কুযুক্তি আমি উপলব্ধি করেছিলাম সেই একটু সময়ের মধ্যেই।

তখন আমার বেকারত্ব'র দেড় বছর পূর্ণ হয়েছে। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'দিক দিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যায়, সেই দু'দিকেই দু'টো সিগারেটের দোকানে প্রচুর ধার করে ফেলেছি, বাড়ি থেকে বেরুলেই মুস্কিল। দু'তিন দিন অন্তর দাড়ি কামাই, তাও ব্লেডের পয়সা জোটানো এক কষ্টকর ব্যাপার। বাবার প্রায়ই হার্টের দোষ দেখা দেয়, ছুটি নিতে নিতে হাফ-পে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, সংসারে রোজ টানাটানি, সেই সময় আমি একটা সুস্থ সবল ছেলে, অনেক পয়সা ও পরিশ্রম খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী জোগাড় করেছি, অথচ এক পয়সা রোজগার নেই—লজ্জায় কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারি না।

হঠাৎ এক বন্ধুর দৌলতে একটা কাজ পেয়ে গেলুম। চাকরি নয়, টিউশানি, কিন্তু চাকরিরই মতন প্রায়, একটি মেয়েকে বাংলা শেখাতে হবে রোজ সন্ধ্যেবেলা, মাইনে একশো টাকা। মেয়েটি তার বাবা মায়ের সঙ্গে বিলেতে-আমেরিকায় কাটিয়েছে বহুদিন, তাই বাংলা না-জানার জন্য তার লজ্জা হয়েছে, আমি তো খুশিতে ডগমগো, আমারই পাড়ার একটা ছেলে ক'দিন আগে একটা কেরাণীগিরি পেয়েছে, দু'শো সাতান্ন টাকা মাইনে, তাতেই সে রোজ গর্বের সঙ্গে সেজেগুজে অফিসে যায়—আর আমি শুধু সন্ধ্যেবেলা একটু সময় পড়িয়েই একশো টাকা পাবো! পুরো একশো টাকা!

একটা ব্যাপারে শুধু অস্বস্তি রইলো। ছাত্রীর বদলে ছাত্র হলেই আর একটু ভালো হতো। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করার কোনো চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি। আমি শুধু ভাবতুম একটি যুবতী মেয়ের সামনে রোজ বসতে গেলে জামা-কাপড়-টাপড় একটু পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, না হলে বড় লজ্জা লাগবে। কিন্তু তখন রোজ পাটভাঙা জামা-প্যান্ট পরার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। দাড়িও কামাতে হবে রোজ। ছাত্র হলে এতটা খুঁতখুতুনি না থাকলেও চলতো।

কিন্তু এর চেয়েও আর একটা বড় অসুবিধে দেখা গেল। থাকি শ্যামবাজারে, পড়াতে যেতে হবে নিউ আলিপুরে—প্রত্যেক-দিন ট্রাম-বাস ভাড়া জোগাড় করবো কি করে? মাইনে পাবো একমাস বাদে, কিন্তু সেই প্রথম এক মাস চালাবো কোন্ মন্ত্রবলে? বন্ধুদের কাছ থেকে সিগারেট জক্ মেরে খাই, কিন্তু তাদের কাছে তো পয়সা চাওয়া যায় না। বাড়িতে টিউশানি পাবার কথাটা চেপে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, প্রথম দু'এক মাস মাইনে পেয়ে ধার-টার শোধ করে তারপর না হয় জানাবো।

আমাদের পাশের বাড়ির প্রতাপদা'র ছিল ট্রামের মান্থলি টিকিট, বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তিনি আর বিশেষ বেরুতেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাঁর কাছ থেকে মান্থলি টিকিটখানা প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা ধার নেবার ব্যবস্থা করলুম। এতে শ্যামবাজার থেকে এস্‌প্ল্যানেড পর্যন্ত আসার একটা সুরাহা হলো, কিন্তু সেখান থেকে নিউ আলিপুর? হেঁটে আসা যায় না। গরমের দিন, অতখানি রাস্তা হেঁটে এলে ঘামে জামার অবস্থা বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যায়। কি উপায়ে যে রোজ সেই পয়সা জোগাড় করতুম, তা বেকার ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না।

সেই সময়েরই একদিনের ঘটনা। ছাত্রীটি বেশ বুদ্ধিমতী, মোটেই চালিয়াৎ নয়, বাড়ির লোকজনও বেশ ভালো, চায়ের সঙ্গে রোজই নানারকম খাবার আসে, আমার সঙ্গে সবাই বেশ সম্মান

করে কথা বলে। আমিও এমন ভাব দেখাই, যেন নেহাত শখ করেই আমার টিউশানি করতে আসা—টাকা পয়সার কথা নিয়ে আমি কোনোরকমই মাথা ঘামাই না। ছাত্রীর বাবা প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন, অনেক রাত হয়ে যায়।

একদিন কথায় কথায় রাত দশটা বেজে গেছে। সেদিন শুধু গল্পের জন্য নয়, দারুণ বৃষ্টিতে বেরুতে পারিনি। ছাত্রীর বাবা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, বৃষ্টি যদি না থামে, তিনি আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেবেন, কিন্তু বৃষ্টি থামার পর তিনিও আর কিছু বলেন নি, আমিও বলিনি।

নির্জন রাস্তা, বাস বন্ধ হয়ে গেছে কিনা ঠিক নেই, পকেটে একটি মাত্র সিকি, হাত দিয়ে সেটাকে সারাক্ষণ চেপে ধরে আছি। সিগারেট খাওয়ার জন্য বুকের ভেতরটায় ছট্‌ফট করছে, কিন্তু সিগারেট কিনে খাওয়ার অভ্যেস একেবারেই ত্যাগ করেছি। এই সিকি থেকে পয়সা বাঁচিয়ে রাখতে হবে কালকের জন্য। এই সময় দূরে একটা বাস দেখা গেল, আমি উঠে কণ্ডাক্টরের থেকে অনেক দূরে গিয়ে বসলুম। বাসে ভিড় নেই, ভিড়ের বাসে তবুও যদিবা টিকিট ফাঁকি দেবার সুযোগ পাওয়া যায়, আজ আর কোনো আশাই নেই।

কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতেই আমি সিকিটা বাড়িয়ে দিলাম। উদাসীন ভাবে বললাম, এস্‌প্ল্যানেড। লোকটা সিকিটা নিয়ে ব্যাগে ফেলতে গিয়েও তুলে ধরলো, উঁচু করে কি যেন দেখলো, তারপর হাতের তালুতে ঘষে, আমার চেয়েও উদাসীন গলায় বললো, বদলে দিন, এটা অচল!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অচল? অচল কথাটার মানে কি? এ রকম একটা অর্থহীন শব্দ যেন জীবনে কখনো শুনিনি! বিহ্বল গলায় বললাম, কি বলছেন?

—সিকি অচল।

—অচল কেন?

—তা আমি কি করে বলবো! যে বানিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করুন। এতো খাঁটি সীসে! বদলে দিন।

যন্ত্রের মতন হাত বাড়িয়ে আমি সিকিটা নিলাম। আশ্চর্য, আমি এতই বোকা, আগে লক্ষ্যই করিনি, সিকিটা সত্যিই ডাহা জাল। এই টানাটানির সময় এই রকম মতিভ্রম ?

—কই, অন্য সিকি দিন!

—আমার কাছে আর পয়সা নেই।

—আর পয়সা নেই! শুধু এই অচল সিকি নিয়ে উঠেছেন? ভেবেছেন এই রাত্তির বেলা গছিয়ে দেবেন? বার করুন আর কি আছে।

অপমানে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। বাসের সব লোক এদিকে চেয়ে মজা দেখছে। আমার প্রায় কান্না এসে যাচ্ছিল! এরা কেউই বিশ্বাস করবে না, সত্যিই আমি জানতুম না, ওটা অচল! অভিমানী গলায় আমি বললুম, ঠিক আছে আমি নেমে যাচ্ছি!

কণ্ডাক্টর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তা তো যাবেনই! জামা-কাপড় তো ভদ্দরলোকেরই মতন! আজকাল দেখলে কারুকে বোঝা যায় না—কে ভদ্দরলোক আর কে জোচ্চোর!

সব অপমান গায়ে মেখে আমি বাস থেকে নেমে পড়লাম। ইচ্ছে হলো রাস্তার ওপর বসে থাকি। কিংবা কোনো চলন্ত গাড়ির তলায় মাথা পেতে দিই! কিন্তু এসব ইচ্ছে বেশীক্ষণ থাকে না। বাড়ি ফেরার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠলো। এখানে বেশী দেরী হলে আবার এস্‌প্ল্যানেড থেকে লাষ্ট ট্রাম চলে যাবে—তা হলে এতটা রাস্তা হেঁটে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত শেষ। বাবা নির্ঘাৎ পুলিশে খবর দেবেন। কি করি এখন।

যা থাকে কপালে, বলে একটা দোতলা বাসে উঠে পড়লাম রাসবিহারী মোড় থেকে। কণ্ডাক্টর এলে হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলবো, আমার পকেটে একটা সিকি আছে, সেটা অচল আমি

জানতাম না—আমাকে বিনা পয়সায় যেতে দিন। হয়তো তার দয়া হতেও পারে। সব মানুষই তো আর খারাপ হয় না। অচল সিকি আবার চালাবার চেষ্টা করবো না।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছি, ওপর তলার একেবারে শেষ সিঁড়িতে আমার পায়ে কি যেন লাগলো। তাকিয়ে দেখি, একটা পেট-মোটা মানি ব্যাগ। কুড়িয়ে নিলাম। কিছু না ভেবেই সেটা খুলে দেখতে গিয়ে আমার চোখ ঠিক্‌রে আসবার উপক্রম! ব্যাগটার মধ্যে থরে থরে সাজানো একশো টাকার নোট, আগেকার সেই বড় সাইজের নোট—চিনতে ভুল হয় না। এক নজর দেখেই বুঝতে পারলুম, অন্তত তিন চার হাজার টাকা, কিছু খুচরো দশ-পাঁচ টাকার নোটও আছে, কয়েকটা কার্ড একটা ছবি, আর একটা সোনা-বাঁধানো জিনিস—অনেকটা মেয়েদের ব্রোচের মতন।

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঠাণ্ডা স্রোত খেলে গেল। আমার হাতের মুঠোয় চার হাজার টাকা, এই টাকা পেলে একটু আগে আমি যে অপমান সহ্য করেছি, সে রকম সব কিছুর প্রতিশোধ নিতে পারি। আমার জীবনের রং বদলে যেতে পারে। উঃ, চার হাজার টাকা! উত্তেজনায় আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। ব্যাগটা হাতে নিয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম, দোতলায় অল্প কয়েকজন মাত্র লোক বসে ঝিমোচ্ছে, আমাকে লক্ষ্য করেনি, কণ্ডাক্টর নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছে তার পার্টনারের সঙ্গে।

কয়েক সেকেণ্ড সেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। সেইটুকু সময়ের মধ্যে আমার মধ্যে—এত বছরের মানব সভ্যতার ইতিহাসে যতটুকু উন্নতি ও অবনতি হয়েছে সব খেলা করে গেল। আমি জানি আমার কি কি করা উচিত, ব্যাগের ভেতরের কার্ডের নাম দেখে আমি যাত্রীদের জিজ্ঞেস করতে পারি—এটা তাদের কারুর কিনা! উপযুক্ত প্রমাণ দিলে ফেরৎ দেওয়া উচিত। কিংবা এটা থানায় জমা দেওয়া যায়, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া যায়। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে একটা কথাই আমার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠলো,

যদি আমি একবার বাস থেকে নেমে পড়তে পারি—তা হলে এ টাকা আমার! এতগুলো টাকা!

কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, অন্য যাত্রীরা হয়তো আমাকে লক্ষ্য করেনি। মন স্থির করে আমি চট্‌পট্‌ নেমে এসে বাসের গেটের কাছে দাঁড়ালাম।

ময়দানের পাশ দিয়ে বাস ছুটেছে, ফাঁকা রাস্তা, দুর্দান্ত স্পীড। এখানে স্টপগুলোও অনেক দূরে দূরে। আমার বুকের মধ্যে দুম্‌দুম্‌ শব্দ হচ্ছে, হাত কাঁপছে, থরথর করে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না। আর এক কি আধ মিনিট—বাস থামলেই লাফিয়ে নেমে পড়বো। একবার রাস্তার লোকদের মধ্যে মিশে গেলে এখন আমার পকেটে বাসের ভাড়াও নেই, কিন্তু আমি এক্ষুনি ট্যাক্সি চাপবো! বাসটা কখন থামবে! এত জোরে ছুটছে যে নামতে গেলে আমার হাত-পা ভেঙে যাবে? আর ক'টা মুহূর্ত…

এমন সময় সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ, একজন লোক চীৎকার করতে করতে নেমে এলো, আমার ব্যাগ। আমার ব্যাগ। আমার পার্স কে নিয়েছে?

সমস্ত শরীরটা আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার কি হবে আমার আমি জানি। সমস্ত লোক হৈ-হৈ করে আমাকে জাপটে ধরবে। পকেট-মার হিসেবে আমাকে মারবে, মারতে মারতে আমাকে মেরেই ফেলবে ওরা। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো, না, না, আমি চোর নই। আমাকে মেরো না। মেরো না।

কিন্তু প্রমাণ কি। আমি তো ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ব্যগ্রভাবে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কোনো যুক্তি নেই।

লোকটি আমার কাছে নেমে এসেছে, আমি ব্যাগ সমেত হাতটা বাড়িয়ে দিলাম নিঃশব্দে।

লোকটি সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। লোকটিকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস হলো না আমার, ভেতরের কার্ডগুলোর

সঙ্গে তার নাম মেলাতে পারলাম না। যে নিজে অপরাধী সে তো আর বিচারক হতে পারে না। লোকটির দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আমি শাস্তি পাবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

লোকটি আসলে মারলো না, চ্যাঁচালো না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসলো। তার পরের মুহূর্তে'ই সে চলন্ত বাস থেকে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে ঝুপ করে নেমে গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, লোকটি আছাড় খেয়েও পড়েনি, কোন রকমে ঝোঁক সামলে নিয়েছে, এবং সেই রকমই অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

এর দু'মাস বাদেই আমার টিউশানিটা গেল। আমার ছাত্রীটি বেশ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। কিন্তু কেন তার মতিভ্রম হলো কে জানে, একদিন সে আমার হাতের ওপর হাত রেখে বললো, মাষ্টারমশাই, আপনি আমাকে একটুও ভালবাসবেন না?

আমি দু'পাশে ঘাড় নেড়ে বললুম, না।

ছাত্রী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, কাঁদতে কাঁদতেই বললো, আপনি কি নিষ্ঠুর!

আমি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম।

ছাত্রীটির মা কিংবা বাবা কেউ এ দৃশ্য দেখে ফেলেছিল কিনা জানি না। তার দু'দিন বাদেই তাঁরা অত্যন্ত ভদ্রতা ও লজ্জার সঙ্গে আমাকে জানালেন, যে আমার আর আসার দরকার নেই। এর জন্যে আমি কিছু মনে করবো না তো? তাঁরা এক মাসের মাইনে অতিরিক্ত দিয়ে দিতে রাজী আছেন। আমিও অত্যন্ত ভদ্রতা ও লজ্জার সঙ্গে বললাম, না, না, এতে আর মনে করার কি আছে?

এর ছ'মাস বাদেই ডাকে তার বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেলাম। ডাকে পাঠানো চিঠিতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে নেই—এই অবস্থাতে আমি আর গেলাম না, তাছাড়া উপহার দেবারও একটা প্রশ্ন ছিল।

আরও ছ'মাস বাদে লাইট হাউস সিনেমার সামনে আমার সেই

ছাত্রী ও তার বরের সঙ্গে দেখা। আমি অবশ্য তখন একটা চাকরি পেয়েছি। আমার ছাত্রীটির কপালে নতুন সিঁদুর, মুখখানা জ্বলজ্বলে, হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে আমাকে ডেকে বললো, মাষ্টারমশাই, আসুন আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে আমার—

হাত জোড় করে আমি দৃষ্টি স্থির করে রইলাম। চিনতে আমার একটুও দেরী হয় নি।

ছাত্রীর স্বামীও নিশ্চয় আমাকে চিনতে পেরেছে, কেননা, মুখে সেই রকম অদ্ভূত হাসি! এই সেই লোক—আমার হাত থেকে মানি ব্যাগটা নিয়ে যে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়েছিল!

ছিঃ দীপা, এ রকম একটা লোক তোমার মাষ্টারমশাই ছিল? একথা কি ও আমার দিকে তাকিয়ে বলবে? আমার কিন্তু আর ভয় করছে না—আমি ওর দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে আছি।

ছাত্রীর স্বামী সে সব কিছুই বললো না। বরং চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলো। আমি এবার বললাম, চিনতে পারছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো তো! আচ্ছা আজ চলি, সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে ··।

যাবার আগে ছাত্রীটি আমার দিকে তাকাতেই আমি রহস্যময় ভাবে হাসলাম।

সেদিনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, আজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, এই লোকটির ম্যানিব্যাগ নয়, আমার ওপরে টেক্কা দিয়েছিল। আমি সৌখিন চোর হতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ও অনেক পাকা—তাই ও আমার চেয়ে অনেক সার্থক হয়েছে।

ছাত্রীটির প্রতি আমি মনে মনে বললাম, ভয় নেই, তুমি জীবনে সুখী হবে। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান লোকের হাতে তুমি পড়েছো! ভাগ্যিস, আমি তোমাকে ভালোবাসিনি, তাই তো তোমার এই সৌভাগ্য!

॥ ২৬ ॥

কি পণ করবো? লবো স্বদেশের দীক্ষা? নতুন করে আবার স্বদেশের কথা চিন্তা করার দরকার আছে? আমার মতন বয়েস যাদের, এক হিসেবে তাদের বেশ দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মাইনি, আমরা জন্মেছি পরাধীন দেশে। কিন্তু তখনকার স্বাধীনতার লড়াইয়েও আমরা কোনো অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইনি। আমরা তখন খুবই ছোট ছিলাম, স্কুলের ছাত্র, মাঝে মাঝে দাদাদের নির্দেশে মিছিলে গেছি, ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটেছি এদিকে-ওদিকে। গোরা-পুলিশ তখন দেখতাম অহরহ, একবার এক সাহেব-সারজেনট-এর হাতের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিলাম, যত না আঘাত লেগেছিল, তার চেয়ে বেশী অপমান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর একটু বড় হয়ে নিই, তারপর তোমাদের দেখে নেবো।

সেই অল্প বয়সে অবস্থা-পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। আমরা জানতাম, পরাধীন অবস্থা আরও বহুদিন চলবে, অনেক আত্মত্যাগ, অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা জিতে নিতে হবে। হায়, আমাদের প্রায় নিরাশ করেই স্বাধীনতা এসে গেল বেশ তাড়াতাড়ি। নৈরাশ্যের কারণ, আমরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সুভাষ-মতে বা গান্ধী-মতে লড়াইয়ে নামতে পারলাম না—। আর, স্বাধীনতার সঙ্গে অনেক বেদনা জড়িয়ে গেল, দেশ ভাগ হয়ে গেল, বীভৎস দাঙ্গা হলো ধর্মের নামে।

দেশের মধ্যে, দেশের মানুষের মধ্যে দলাদলি খুনোখুনির ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা এলো বলে, আমরা এই স্বাধীনতার ঠিক স্বাদ পেলাম না। পরাধীন ভারতে স্বদেশের দীক্ষা নেবার যতটা দরকার ছিল, স্বাধীন ভারতেও তার দরকার কম ছিল

না। কিন্তু স্বাধীনতার পরই আমাদের মধ্যে বিদেশীআনা বেশী করে আসতে লাগলো।

স্বাধীনতার পর, আমরা যখন সদ্য কৈশোর ছাড়িয়েছি, তখনও দেশ গড়ার কাজে আমাদের কাছে কোনো ডাক এলো না। বিদেশী শাসকরা চলে গেল বটে, কিন্তু স্বদেশী শাসকরা নিজেদের একটা আলাদা জাত হিসাবে তৈরী করে ফেললেন। তাঁরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, বক্তৃতামঞ্চ ছাড়া তাঁরা সাধারণ মানুষের সামনে আসেন না, মিথ্যে কথা বলতে তাঁদের কোনো দ্বিধা নেই।

সারা জীবন ধরে অহিংসার বাণী প্রচার করে গান্ধীজী খুন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে 'জাতির পিতা' আখ্যা দেওয়া হয়ে গেল, এবং বাড়তে লাগলো রাষ্ট্রপতি ভবন আর 'রাজভবনের' জাঁকজমক। উত্তর ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রনায়ক হো-চি-মিন যে অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাপনের নমুনা রেখে গেলেন এই ত্যাগবাদী দেশে তার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা গেল না।

আমরা জানতে পারলাম, রাজনীতি একটা পেশা, এর সঙ্গে দেশপ্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণের জন্য বেদনা অবশ্য সব দলেরেই উপছে পড়েছে, এবং প্রত্যেক দলেরই ধারণা অন্যদের 'বেদনা' কৃত্রিম। নারীকে ভালোবাসায় ঈর্ষার স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম দেশকে ভালোবাসা নিঃস্বার্থ হবে। ডেমোক্রেসি, সোস্যালইজম, কম্যুনিজম—সব কটিরই উদ্দেশ্য যদি হয় সমস্ত মানুষের সমান সুযোগ ও অধিকার, তা হলে পথ নিয়ে এত ঝগড়া কেন? আমরা জানি, গণতান্ত্রিক পথে দু'একটি দেশ প্রভূত উন্নতি করেছে, আবার কম্যুনিজমের পথে সমাজবাদেও দু'একটি দেশ তার সমান উন্নতি করেছে। গণতন্ত্রের অনেক ত্রুটি আছে, সেগুলো শোধরাবারও পথ খোলা আছে। গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তার অনেক সুফল আছে বটে, কিন্তু এই প্রতিযোগিতার মনোভাব কখনো কখনো অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ডেকে আনে। সোস্যালইজমের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক নেই, আক্রান্ত

হলে আত্মরক্ষার অধিকার আছে। প্রথম যৌবনে আমরা গণতন্ত্রের বদলে সোস্যালইজম—কম্যুনিজমকে প্রকৃষ্টতর মনে করতাম। কিন্তু এখন দেখছি, একটা সোস্যালিস্ট দেশ আর একটি সোস্যালিস্ট দেশকে আক্রমণ করতে পারে। আমাদের দুঃখ রাখার জায়গা রইলো না। চীন ও রাশিয়ার সীমান্ত বিরোধের খবরে আমরা স্তম্ভিত। সাম্যবাদ অনুযায়ী—এই পাশাপাশি দুই দেশের কোনো সীমারেখাই তো থাকার কথা নয়। পূর্ব ইওরোপের সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ঝগড়া না থাকলেও সীমারেখা রয়েছে কেন? ভাষা, সংস্কৃতির ব্যবধান যদি এত প্রবল হয় তবে এক দেশের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কি অন্য দেশের সমস্যা দূর করা যায়?

নানা কারণে অনেকেই দেশ নামক সীমারেখাটি তুচ্ছ করেছেন। অনেক কবি শিল্পী দেশের সীমারেখা মানেন না। রবীন্দ্রনাথও 'বসুধাকে খণ্ড ক্ষুদ্র করি' দেখতে চান নি, বিশ্ব নাগরিক হতে চেয়েছেন। গণতান্ত্রিক দলগুলির নেতারা দেশকে আরও টুকরো টুকরো হতে দিচ্ছেন। দেশের জন্য কারুর প্রকৃত মনোবেদনা নেই, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাই প্রধান কাজ। নবীন বিপ্লবীরা অন্যদেশের চেয়ারম্যানকে নিজেদের চেয়ারম্যান বলছেন। মারক্সইজমকে অবলম্বন করেই আমাদের এখানে আট ন'টি আলাদা দল। অন্তত পাঁচটি দল বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী—অথচ তারা আলাদা। অর্থলোভের চেয়ে ক্ষমতার লোভ কম শক্তিশালী নয়। জোতদার বা মুনাফাবাজরা অন্যদের বঞ্চিত করে নিজের ঘরে সম্পদ জমিয়ে রাখে। তা হলে যে-সব লোক বহু বছর ধরে মন্ত্রিত্ব করেছেন বা এক দলের নেতৃত্ব করছেন, তাঁরাও তো ক্ষমতা জমাচ্ছেন এক জায়গায়। মৃত্যু না হলে কিংবা ভোটে না হারলে, কোনো প্রবীণ নেতা কি এ পর্যন্ত কোনো তরুণের হাতে নেতৃত্বের ভার দিয়েছেন?

আমাদের মতন দুঃখী মানুষ নিশ্চয়ই সারা ভারতবর্ষে বহু রয়েছে, যাদের কোনো দল নেই, যারা বিচ্ছিন্ন, যাদের দারুণ আশাভঙ্গ হয়েছে এই ক'বছরে। সাম্যবাদীরা আমাদের ধনতন্ত্রের

দালাল বলে গালাগালি দেবে আর গণতন্ত্রীরা আমাদের বলবে ছদ্ম কম্যুনিস্ট। দু'দলই আমাদের সন্দেহের চোখে দেখে। আমরা বিরলে মন খারাপ করে থাকি। যুক্তিহীনতা, চেঁচামেচি কিংবা মিথ্যে স্তোকবাক্যগুলো চোখে পড়ে বলে আমরা কোনো দলেই যোগ দিতে পারি না। দুঃখ হয়, দলাদলির মূল উদ্দেশ্যটা ক্রমশই পেছিয়ে যাচ্ছে, তা হলো, দেশের এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন—ধনসম্পদ এবং দুঃখ-দুর্দশা সব মানুষের মধ্যে উপযুক্তভাবে ভাগ করে নেওয়া। সেটা বিপ্লবের মাধ্যমে হলেও আপত্তি নেই, কিন্তু বিপ্লব মানে কি অনর্থক খুনোখুনি? আমাদের এখনো মনে হয়, সারা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করার বদলে আমাদের এই দেশ, এই দেশের মানুষ, এর ভাষা—এই সব আমাদের চেনা, এগুলি অবলম্বন করেই আমরা এখানকার সমস্যা সমাধান করতে পারি। ঠিক আমাদের দেশের দুঃখ আর কেউ বুঝবে না। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা তার খেয়ে পরে বেঁচে থাকারই অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের কথা কেউ শুনবে না।

আমরা প্রতিজ্ঞা নিতে ইতস্তত করি, তাতে অন্তত প্রতিজ্ঞা ভাঙার গ্লানিটা সইতে হয় না। ভাটিয়ালি গান শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়, তবু আমরা স্বদেশের দীক্ষা নিইনি।

॥ ২৭ ॥

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার খুব কাছাকাছি বৃন্দাবন পাল লেনের একটি বাড়ির একতলায় থাকি তখন। সদর দরজার কাছেই একটি লম্বাটে ঘর—সেই ঘরে দুটো সিঙ্গল খাট পাতা, লোহার খাট—হাসপাতালের রুগীরা যাতে শোয়। খাট দুটো আমার বাবা শিয়ালদার চোরাবাজার থেকে কিনে এনেছিলেন। সস্তায় জিনিষ কেনার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল তাঁর।

খাট দুটোয় আমি আর আমার ছোট ভাই অনিল শুতুম রাত্তির বেলা। দিনের বেলা আমার ভাই ও ঘরে ঢোকার বিশেষ সুযোগ পেত না। দিনের বেলা ঐ ঘরখানি ছিল একটি তুমুল আড্ডাখানা এবং কৃত্তিবাসের অফিস। মাঝে মাঝে রাত্তিরেও বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ ও ঘরে থেকে যেত - ফণিভূষণ আচার্যের বিয়ের রাত্রে আট ন'জন বন্ধু কি ক'রে ঐ ছোট ঘরে শুয়েছিল কে জানে—প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি লম্বা বিমল রায় চৌধুরী জানলার বেদীতে কি করে সারারাত শুয়েছিল, তা আজও এক বিস্ময়।

সিটি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি আমি তখন, দীপক মজুমদার এবং আনন্দ বাগচী পড়ে স্কটিশের ফার্স্ট ইয়ারে - দীপক আমার স্কুলের বন্ধু—জেল খাটার ব্যাপার-ট্যাপারে আমার দু'বছর পর—ম্যাট্রিক পাশ করেছিল—এবং আনন্দ বাগচী তখনই বিখ্যাত লেখক, আমিই সবচেয়ে অখ্যাত নগন্য ছিলাম—তিনজনে কৃত্তিবাস বার করি। বস্তুত আমি কবিতা লেখা সুরু করি দীপক মজুমদারের অনুকরণে। ইস্কুলে পড়ার সময়েই দীপক খ্যাতনামা কবি—নানা বামপন্থী কাগজে ওর বড় বড় কবিতা ছাপা হয়, ওর বন্ধু শচীন ভৌমিকের সঙ্গে (শচীন ভৌমিক সাহিত্য ছেড়ে এখন বোম্বের সিনেমা মহলে খুব টাকা পিটছে শুনতে পাই) 'ভাষণ' নাম দিয়ে

মার্কসবাদী প্রবন্ধ সংকলন সম্পাদনা করে ফেলেছে, বিমল ঘোষ কিংবা গোপাল হালদারকে দীপক যথাক্রমে বিমলদা এবং গোপালদা বলে ডাকে—আমি দীপককে যথেষ্ট ঈর্ষা করতুম। স্কুলে পড়ার সময় কবিতা-টবিতা বা কোনরকম সাহিত্য রচনার কথা আমার মাথাতেই আসেনি। ঘুড়ি ওড়াবার দারুণ নেশা ছিল, বন্ধু আশু ঘোষের সঙ্গে প্রায় টুপটাপ করে বাইরে বেড়াতে যেতুম, অতিশয় দরিদ্রের সন্তান বলে ক্লাস সেভেন-এ পড়ার সময় থেকেই টিউশানি করতে হয়েছে আমাকে—সাহিত্য কোথাও ছিল না। কিন্তু ইস্কুলের বন্ধুরা যখন দীপক মজুমদারকে বেশ একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতো—আমার রাগ হতো—আমি বলতুম, যা যাঃ, কবিতা লেখা কি আর শক্ত, যে-কেউ লিখতে পারে! অবশ্য, রাগ হলেও, দীপক এমনই এক অদ্ভুত চরিত্রের ছেলে যার আকর্ষণ কাটানো যায় না—সুতরাং দীপকের বন্ধু হবারও সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের তিনমাস ছুটি। তখন আমি বেশ আদর্শবাদী ছিলুম। তীব্র রোমান্টিক দেশপ্রেম আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। আমার একমাত্র উচ্চাকাঙ্খা ছিল দেশের সেবা করা। মুচি, পরামানিক এদের লেখাপড়া শেখানো—গ্রামে গিয়ে রাস্তা বানাবো, রুগীর সেবা করবো—বাথরুমে ঢুকলেই এইসব ভালো ভালো চিন্তা আমাকে পেয়ে বসতো। ১৫ই আগস্ট, ২৬শে জানুয়ারি, ২৩শে জানুয়ারি এই সব দিন সকালবেলাই স্নান টান সেরে সশ্রদ্ধ চিত্তে মিটিং শুনতে যেতাম। বয়স্কাউট এবং মনিমেলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে আমি কুচকাওয়াজ, বিউগ্‌ল বাজানো, ফার্স্ট-এড শিখে নিয়েছি। দাঙ্গার পর মহাত্মা গান্ধীর শান্তি মিছিলে যোগ দিয়ে বেলেঘাটায় এক মুসলমানের হাত থেকে জল খেয়ে অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বলা যায় না, যদি ঠিক ঠাক সুসঙ্গে পড়তাম, এতদিনে হয়তো আমি সর্বোদয় আন্দোলনের একটা ছোটখাটো নেতাও হ'য়ে যেতাম। কিন্তু আমাকে পথভ্রষ্ট ও নষ্ট

করলো বাল্য প্রণয় ও সাহিত্যের পোকা। প্রেম এবং সাহিত্য এই দুটোই মানুষকে সমষ্টি থেকে ছিনিয়ে এনে নিঃসঙ্গ করে দেয়। ফলে, আমার সমাজ সেবক হওয়া হলো না—একটা পুঁচকে মেয়ে আর একদল বখাটে ছোকরা লেখক আমাকে পথ ভুলিয়ে দিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের সেই তিন মাসের ছুটি থেকে শুরু।

তখন আমি এক বন্ধুর বোনের প্রেমে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছি। প্রত্যেক দিন দু'বেলা দু'খানা করে চিঠি লিখি, সেগুলো রবীন্দ্রনাথের কোটেশান-কণ্টকিত, বিদ্যে ফলাবার জন্য মাঝে মাঝে ব্রাউনিং কীটস্‌ও। বাড়ি থেকে কিছু একটা সন্দেহের আঁচ দেখা দিল। বাবার কড়া হুকুম হলো—দুপুরবেলা আমি বাড়ি থেকে বেরুতে পারবো না। ইংরেজি শেখার জন্য, বাবা আমাকে একটা টেনিসনের কাব্যসংগ্রহ দিয়ে বললেন, রোজ দুপুরে তার থেকে দুটি করে কবিতা অনুবাদ করতে হবে। সে কি অসম্ভব দুঃখময় জীবন। গ্রীষ্মের দুপুরে টেনিসনের কবিতা! বন্দীদশায় কষ্ট লাঘব করার জন্য আমি একটা কায়দা বার করলুম। টেনিসনের এক একটা কবিতা বার করে লাইন গুনে নিয়ে বই মুড়ে রাখতুম। ধরা যাক্ চব্বিশ লাইন —অনুবাদ না করে মন থেকে বানিয়ে ২৪ লাইন লিখে ফেলতুম নিজেই। প্রেমে পড়ার ফলেই কবিত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কিনা জানি না—কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই লেখা হয়ে যেতো— বাকি সময়টা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরী সিরিজে মজে থাকতুম। বাবা অনুবাদগুলো মিলিয়ে দেখতেন না। বিকেল বেলা বলতেন, কি অনুবাদ করেছিস, প'ড়ে যা! আমি গড়গড় ক'রে পড়ে যেতুম নির্ভয়ে। বাবার কাছ থেকে কোনদিনও বাহবা পাইনি, কোনো উৎসাহ বাক্য শুনিনি, নিছক দুপুরের টাস্ক হিসেবেই সেগুলো দেখতেন। পত্রিকা বলতে 'দেশ' আর 'বসুমতী' ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকার নাম জানতুম না। বসুমতী দেখতে কি ছিরি, দেশ খানিকটা ছিমছাম—তাই একদিন কি খেয়ালে 'দেশ' পত্রিকার ঠিকানায় ঐ একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। কিছুদিন বাদেই

আমার নামে ডাকে একটা দেশ পত্রিকা এলো—তাতে ঐ কবিতাটি ছাপা হ'য়ে গেছে! ছাপার অক্ষরে নিজের প্রথম লেখা দেখে খুব যে আনন্দ হয়েছিল তা নয়। কোথাও একটা কবিতা ছাপা হওয়া যে কোন সাংঘাতিক ঘটনা এ জ্ঞানই আমার তখন ছিল না। কারণ, দেশের ঐ কবিতাটার কথা আমি আমার প্রেমিকাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলুম বলে সে খুব রাগ করেছিল এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন আর কোনো কবিতা—ছাপার জন্য পাঠাবার কথা আমার মনেই আসেনি।

থার্ড ইয়ারে যখন পড়ি— আমার তখন সর্বসমেত গোটা ছ'য়েক কবিতা ছাপা হয়েছে, দীপকের বন্ধু, আমরা দু'জনে ঠিক করলুম, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের অনুকরণে দুজনে একসঙ্গে একটি কবিতার বই বার করবো। বড় বড় ব্যাপার ছাড়া দীপকের মাথায় কিছু আসে না। সিগনেট প্রেস তখন প্রকাশনার জগতে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে—দীপক ঠিক করলো আমাদের বই ছাপবে সেই সিগনেট প্রেস। দীপকের অটোগ্রাফ খাতায় রামকিঙ্কর বেইজ একটা স্কেচ এঁকে দিয়েছিলেন, এক বিশাল চেহারার রমণীর পায়ের কাছে একজন খুদে পুরুষ—ঠিক হলো সত্যজিৎ রায়কে অনুরোধ করা হবে —ঐ স্কেচ্ অনুযায়ী মলাট এঁকে দিতে। দুজনে চলে গেলুম সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। দীপক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব খবর রাখে— সত্যজিৎ রায়ের ডাক নাম যে মাণিক তাও তার জানা, প্রথমেই সে মাণিকদা বলে সম্বোধন করে ফেললো। আমি একটু বেশী লাজুক— আমি এলেবেলের মতন এক পাশে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাদের প্রস্তাব শুনে সত্যজিৎ রায় অপ্রস্তুতভাবে গলা খাঁকারি দিলেন, চেয়ারে বসে স্বস্তি না পেয়ে খাটে আধশোয়া হলেন, কিন্তু ছেলে মানুষের প্রগল্ভ আবদার শুনেও অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন না, দু একটা কবিতা শুনলেন পর্যন্ত, আলগা ভাবে নিলেন, বাঃ ভালোই তো, বেশ বেশ—তা আপনারা এক কাজ করুন, সিগনেট প্রেস থেকে যখন ছাপাকেন ঠিক করেছেন, তখন ওখানকার

ডিকে অর্থাৎ দিলীপ গুপ্তর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, মলাটের কথা পরে দেখা যাবে। দীপক অবদমিতভাবে বললো, মলাট কিন্তু আপনাকেই আঁকতে হবে—আমরা আপনাকে দিয়েই আঁকাবো ঠিক করেছি, অন্য কারুর আঁকা চাই না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আগে ডিকের সঙ্গে···। এলগিন রোডে চমৎকার সাজানো গোছানো বাড়ি সিগনেট প্রেসের। এইসব বাড়িতে সাধারণত কুকুর থাকে। আমার দারুণ ভয়। সোফা-কৌচে বসার অভ্যেসও আমার নেই। দীপক অকুতোভয়। আসলে, আমাদের যদি বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকতো সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে দেখা করার সাহসই পেতুম না। ওঁর মতো ব্যস্ত বিখ্যাত লোকের দেখা পাওয়াই দুর্লভ। কত বিখাত গ্রন্থকার সিগনেট প্রেস থেকে বই ছাপা হলে ধন্য হয়ে যায়—আমরা তো কোন্ ছার। কিন্তু অকুতোভয় বলেই দীপক নানা কীর্তি করতে পেরেছে। আর আমি তো তখন ছিলুম ওর আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র। আমার তখনই বেশ বড়ো সড়ো চেহারা, কলেজের মারামারিতে আমার ডাক পড়ে—আর দীপক রোগা টিং টিং-এ, ছোটখাটো—কিন্তু বিনা দ্বিধায় আমায় হুকুম করে এবং মানতে বাধ্য করে। আমি বরাবরই দেখছি, রোগা লোকেরা অনায়াসে আমাকে গলার জোরে দমিয়ে রাখে; ওর সব কটি মতামত আমি মেনে নিতে বাধ্য হই। যেমন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় জীবনে কত উল্টো কথাই যে আমাকে বুঝিয়েছে, যেমন বিমল রায়চৌধুরী—কত ডাহা মিথ্যে কথা যে আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে! একমাত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই রোগা হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বিশেষ কব্জা করতে পারেনি—রোগা লোকদের মধ্যে একমাত্র শক্তিই, দিনের বেশীর ভাগ সময়, বিনীত নম্র থাকে।

চাকরের হাতে শ্লিপ পাঠিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি। দিলীপ কুমার গুপ্ত এসে ঢুকলেন, বিশাল রাশভারী চেহারা, গমগমে কণ্ঠস্বর। এই এক আশ্চর্য মানুষ, যখন হাসেন বুকের সব জানালা খুলে দেন।

আমাদের মতন দুটি নোংরা জামা কাপড় পড়া চোয়াড়ে চেহারা'র ছোঁড়াকে তিনি একটুও অবহেলা করলেন না, যেন তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, সকাল ন'টায় গিয়েছিলুম—উঠলুম বেলা দেড়টায়—মাঝখানে কত লোককে তিনি দেখা না করে ফিরিয়ে দিলেন, তবু আমাদের সঙ্গে গল্প তাঁর ফুরোয় না। সে এক রহস্যময় ব্যাপার। যাই হোক দীপকের প্রস্তাব শুনে তিনি একটুও নিরুৎসাহ দেখালেন না। বরং দারুণ আগ্রহ। শুধু একটি ছোট পরামর্শ তিনি দিলেন। শুধু দু'জনের কবিতা নিয়ে স্বার্থপরের মতন বই বার করবে কেন? আরও অনেকের কবিতা নিয়ে বই করো—যাকে বলে পত্রিকা। একটি নতুন কবিতার পত্রিকা হোক—যাতে শুধু তোমাদের মতন তরুণদেরই কবিতা থাকবে।

কৃত্তিবাস পত্রিকার সেই থেকে জন্ম। পত্রিকার সমস্ত পরিকল্পনা ডি কে করে দিয়েছিলেন। নাম তাঁরই ঠিক করা। প্রথম সংখ্যার মলাটের ডিজাইন, মলাটের ব্লক, কাগজ, লে-আউট—সবই তাঁর বুদ্ধি। এবং আর একটি কথাও তিনি বলেছিলেন, তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই, তোমরা নেবে? বিজ্ঞাপনের দামের বদলে আমি ছাপার কাগজটা সব দেবো।—এরকম অসাধারণ ভদ্রতার নজীর আমি আর দ্বিতীয়বার কারোর কাছ থেকে পাইনি।

দীপকের তখন কোন আয় নেই, আমি দু'জায়গায় টিউশনি করে দশ প্লাস পনেরো এই পঁচিশ টাকা পাই—শ্যামপুকুরের বস্তীতে এক মুদীর ছেলেকে এবং কুমোরটুলীর এক কেলটি জড়ভরত মেয়েকে রোজ দু'বেলা পড়াতে হয়। আনন্দ বাগচীকেও আমরা সম্পাদক হিসেবে রেখেছিলাম—কারণ সে তখনই বেশ নাম করা কবি ও ও দীপকের বন্ধু। সত্যি কথা বলতে কি, আনন্দ কোন দিনই কৃত্তিবাসের জন্য তেমন পরিশ্রম করেনি। প্রথম তিন সংখ্যার বেশীর ভাগ কাজ করেছিল দীপক—প্রেসের ব্যাপারে আমার কোনই জ্ঞান ছিল না তখন।

প্রথম সংখ্যার কৃত্তিবাস দেখে সবাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। ও রকম সুমুদ্রিত ঝক্‌ঝকে কবিতা পত্রিকা আজ পর্যন্ত আর একটাও বেরোয়নি—ডি কে'র পরিকল্পনা ছাড়া বাকি কৃতিত্ব সবই দীপকের। অরবিন্দ গুহ, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার—এই সব খ্যাতিমান কবিদের কবিতা জোগাড় করলো দীপক। দীপকের কাজ ছিল—যত পত্রিকায় যত কবিতা বেরোয় সেই সব কবিদের বয়েস ও ঠিকানা জোগাড় করা এবং বয়সে তরুণ হলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কলেজে আমার সঙ্গে তখন পড়তো মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং শিবশম্ভু পাল—যতদূর মনে আছে ওদের কবিতা আগে কোথাও ছাপা হয়নি—আমি ওদের নিয়ে এলুম কৃত্তিবাসে। সেই সময়ের পরিচয় পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষের একটা দুর্দান্ত কবিতা ছাপা হয়েছে। আমাদের ক্লাসে বাংলা পড়াতেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কি কারণে জানি না, তিনি একদিন শঙ্খ ঘোষের ঐ কবিতাটির উল্লেখ করলেন। খুঁজলুম শঙ্খ ঘোষকে—তাঁর বিখ্যাত কবিতা "দিনগুলি রাতগুলি" ছাপা হয়েছে কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায়। চতুর্থ সংখ্যা থেকে কৃত্তিবাসের অফিস হলো আমার বাড়ির ঠিকানায়, দায়িত্বও প্রায় পুরোপুরি আমার ঘাড়েই এসে পড়লো। আমার বখে যাওয়া সম্পূর্ণ হলো। বাড়িতে তুমুল আড্ডা, পড়াশুনো গোল্লায় দিলুম, ততদিনে আমার বাল্য প্রণয় ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমিও আমার লাজুক ভালো মানুষী ছেড়ে —তেড়িয়া একরোখা হ'য়ে উঠেছি। কলেজের মাইনের টাকা ভাঙতে শিখেছি, তাশের জুয়া এবং মদ্যপানে অবিলম্বে দীক্ষা হ'য়ে গেল। সাহিত্যের বিষাক্ত নেশায় মেতে উঠলুম।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কবিতা লেখেন না—কিন্তু গল্প লেখকদের দল ছেড়ে কবিদের সঙ্গেই তার প্রধান আড্ডা। বিপদজনক ও শয়তানি পরিকল্পনায় তার জুড়ি ছিল না তখন। শিল্পের নামে জীবন নষ্ট করাই ছিল তার ব্রত। শক্তি তখন কবিতা লেখে না স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার নামে ছোট গল্প লেখে। নোংরা জামা কাপড় ও

একমুখ দাড়ি নিয়ে কফি হাউসে বসে থাকে ও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে। আমাদের প্ররোচনায় শক্তি অবিলম্বে চলে এলো কবিতার জগতে। দীপকের কলেজেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়তো উৎপল কুমার বসু—লাজুক শান্ত চেহারা—অতি দ্রুত মিচ্কে বদ্মায়েসীতে পাকা হয়ে উঠলো। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত'র যাদবপুরের বাড়িতে তার এলোমেলো বই-এর টেবিল আরও এলোমেলো করে দিয়ে এসেছি। মফঃস্বলে মাস্টারী করতো তারাপদ রায়—প্যান্টের তলায় পাজামা পরে, হাতে টিনের সুটকেশ নিয়ে আসতো মাঝে মাঝে—সবার সামনে প্যান্টের বোতাম খুলে স্ট্রিপটিজ দেখাতো। একে তো বাজখাঁই গলা—কোন রকম সভ্যতার ধার ধারতো না তারাপদ, প্রথম দিন এসেই ধুলো পায়ে আমার বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে র‍্যাক থেকে বইপত্র তুলে নিয়ে বগল বন্দী করলো, আমাদের তাশ খেলায় সেভেন নো ট্রাম্প্স ডেকে হেসে উঠলো হো হো করে। শংকর চট্টোপাধ্যায় তাশ খেলা পছন্দ করে না—তাশ উল্টে দিয়ে সাহিত্য বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতো শুধু।

*   *   *   *

এই লেখাটা শুরু করেই ভুল করেছি। প্রথম দিকে নিজের কথাই সাত কাহন করে বলেছিলুম, তারপর মনে হলো, ছি ছি, সেটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু অন্যদের কথা আনতে গিয়ে দেখছি লেখাটা যে বিরাট বড় হয়ে উঠছে। বুঢ্ঢা আর ভাস্করের কথা বলতে গেলেই তো—কত কথা লিখতে হয়। আর তন্ময় দত্তের আবির্ভাব ও দ্রুত প্রস্থানের নাটকীয় কাহিনী। প্রণব মুখার্জী, মানস রায়চৌধুরী, দীপকের বিবর্তন—এসব আর বলবো কখন! তার চেয়ে কৃত্তিবাসের গোড়ার কথাটুকুই শুধু থাক্। কে কে তখনও আসেনি সেইটুকু শুধু সেরে রাখি।

এখনকার কৃত্তিবাসের স্তম্ভ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তখন আসেনি। সে তখন নমিতা মুখোপাধ্যায় নামে ছেলেখেলায় ব্যস্ত। অনেকদিন পর একদিন এলো—স্যুট টাই পরে, গম্ভীরভাবে।

শরৎকে ফুটপাথে বসাতে বেশ সময় লেগেছে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত —তখন দূর থেকে আমাকে মারবে বলে শাসাচ্ছে। সুধেন্দু মল্লিককে তখনও চিনিই না। সমীর রায় চৌধুরী তখন হাংরি হওয়া দূরে থাক, কবিতা লেখাই সুরু করেনি, কিন্তু সবার অকৃত্রিম বন্ধু সুনীল বসু তখনো লাজুক—এখনো। আর জ্যোতির্ময় দত্তের ওপর অকারণে চটা ছিলুম। গুজব শুনতাম, প্রেসিডেন্সী কলেজের সাতানব্বই বছরের ইতিহাসে ওরকম ব্রিলিয়ান্ট ছেলে নাকি আর আসেনি। তখন কারুর সম্পর্কে ভালো কিছু শুনলেই রাগ হবার সময়। আরও শুনতাম, সে বুদ্ধদেব বসুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। একদিন দেখলাম, সত্যিই শ্যামবাজারে একটা খালি ডবলডেকারে বসে ও বুদ্ধদেব বসুর মেয়ের সঙ্গে গল্পে মশ্‌গুল। বুদ্ধদেব বসু তখন আমার কাছে দেবতার সমকক্ষ—কোনদিন তাঁর কাছে যাবো, কথা বলবো এ সৌভাগ্যের কথা কল্পনাই করতে পারি না এবং তাঁর মেয়েও তো দেবীরই মতন। তার প্রেমিক ঐ জ্যোতির্ময় দত্ত। সে নাকি খুব অহংকারী ও দুর্মুখ এই শুনেছিলাম. সুতরাং আলাপ করার সাহস পাইনি। বুদ্ধদেব বসুর ঐ মেয়েই বা কম কিসের? খুব চালিয়াৎ ছিল তখন, জানি না এখন কেমন! একদিন ভরসা করে বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ২০২ এ গেছি। দরজা খুললো সেই মেয়েটি, মিমি। জিজ্ঞেস করলাম বুদ্ধদেব বসু বাড়ি আছেন? তাঁর সঙ্গে একটু দেখা হতে পারে কি?

সমবয়সী যুবা কিন্তু আমাদের মানুষ বলে গ্রাহ্যই করলো না মেয়েটি, হাতে তেঁতুলের আচার ছিল, তাই চাটতে চাটতে অতিশয় অবহেলা ভরে বললো, হ্যাঁ, বাড়িতে আছেন। কিন্তু, দেখা হবে কিনা বলতে পারি না।